Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যাপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা শরাফত করিম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কুনছুমা আক্তার রুমি
রোলঃ ২১৫০০৪৩৬

৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যাপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা শরাফত করিম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কুনছুমা আক্তার রুমি

রোলঃ ২১৫০০৪৩৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যাপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কুনছুমা আক্তার রুমি, আইডিঃ ২১৫০০৪৩৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা শরাফত করিম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যাপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা শরাফত করিম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

কুনছুমা আক্তার রুমি

আইডিঃ ২১৫০০৪৩৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
★লেখকের কলাম	৬
★ভূমিকা★	৭
★অধ্যায় ১: রাষ্ট্রসমাজ পরিচিতি	৯
★অধ্যায় ২:আধুনিক রাষ্ট্রসমাজ	১৩
★অধ্যায় ৩:রাষ্ট্রসমাজ পরিচালনার মূলনীতিসমূহ	১৫
★অধ্যায় ৪: ইসলামিক রাষ্ট্রসমাজ	১৬
★অধ্যায় ৫: আল কুরআন	২৩
★অধ্যায় ৬: রাষ্ট্র ও কুরআনের মধ্যে সম্পর্ক	২৯
★অধ্যায় ৭:রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি	৩০
★অধ্যায় ৮:সমকামিতা(ল্যাটেস্ট নেইম ট্রান্সজেন্ডার)	৪৬
★অধ্যায় ৯: পুঁজিবাদী শিক্ষা	৫৮
★অধ্যায় ১০: ইসলামের প্রথম যুগে সামাজিক পরিবর্তন	৫৯
★অধ্যায় ১১: জঙ্গিবাদ	৭৪
★অধ্যায় ১২: রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনে আমাদের করণীয়	৮৩
★অধ্যায় ১৩: মূল্যায়ন	৮৪

★লেখকের কলাম

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত,যাঁর অপার করুনায় সকল ভাল কাজ পূর্ণতা পায়। দরূদ ও সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাঃ এর প্রতি যিনি সত্যের বাণী সর্বত্র পৌঁছে দিতে আমাদের আহবান করেছেন। শুকরিয়া আমার রবের যিনি আমার মতো নগন্য বান্দাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করেছেন।

আমাদের থিসিসের বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি। আমি ক্ষুদ্র মানুষ। জ্ঞানের দুনিয়ায় দূর্বল ছাত্রী। লিখালিখির অভ্যাস নেই। আলহামদুলিল্লাহ।

জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অনেককিছুই গুছিয়ে উঠতে পারি নাই। রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি, মহান রব্বুল আলামীন এতো সুন্দর একটা বিষয়ের জন্য আমাকে মনোনীত করেছেন কিন্তু স্বল্প জ্ঞান ও অলসতার কারণে অধিকাংশ কপি পেস্ট করতে হয়েছে।

মহান রব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা তিনি যেন তাঁর এই স্বল্প জ্ঞানের দূর্বল বান্দীকে কবুল করেন।

আমিন

★ভূমিকা★

আল্লাহ কুরআনে বলেন___

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا قِيۡلَ لَـكُمۡ تَفَسَّحُوۡا فِى الۡمَجٰلِسِ فَافۡسَحُوۡا يَفۡسَحِ اللّٰهُ لَـكُمۡ ۚ وَاِذَا قِيۡلَ انْشُزُوۡا فَانْشُزُوۡا يَرۡفَعِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ ۙ وَالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ
١١

*হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে যখন বলা হয়- 'বৈঠক প্রশস্ত করে দাও', তখন তোমরা তা প্রশস্ত করে দিবে, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হয়- 'তোমরা উঠে যাও', তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উচ্চ করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।___ সূরা আল-মুজাদালাহ-**১১***

মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষ যেমন তার পার্থিব প্রয়োজন পূরণের উত্তম পন্থা আবিষ্কার করতে পারে, তেমনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, ন্যায়-অন্যায়বোধ এবং আখিরাতের সফলতা-ব্যর্থতার জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর এ যোগ্যতা নেই। শিক্ষার মাধ্যমে অজানাকে জানার এবং জানা বিষয়কে কাজে লাগিয়ে অজানার সন্ধান করার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে।

সময় ও সমাজের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ বিস্তর। কান পাতলেই বলতে শোনা যায়, সময় বড়ই খারাপ, মানুষের মন থেকে বিশ্বাস ও ধর্মানুরাগ বিদায় নিয়েছে, ভদ্র ও শালীনতার মৃত্যু হয়েছে, মানুষ আল্লাহ ও পরকাল থেকে বিমুখ। এসব অভিযোগ অসত্য নয়। জীবন ও সমাজের যেদিকেই তাকাবেন স্খলনের ঝড় দেখতে পাবেন।

সামাজিক জীবনে পতনের অর্থ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও সদিচ্ছার অভাব। যখন মানুষের সুবুদ্ধি ও সদিচ্ছা দুর্বল হয়, তখনই সে মন্দের প্রতি ধাবিত হয়। যা সমাজজীবনকে নষ্ট করে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে বস্তুগত ও আত্মিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে; বরং যখন কোনো মন্দ বিষয় কোনো জাতির ভেতর ছড়িয়ে পড়ে তা সমাজ ও

রাষ্ট্রের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়। পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় সামাজিক স্খলনের কারণ এবং তা থেকে মুক্তি লাভের উপায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলাম মানব জাতিকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করার নির্দেশ প্রদানকরেই ক্ষান্ত হয়নি। সাথে সাথে সমাজ প্রতিষ্ঠার নীতিমালাও প্রদান কে◌েছ। ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য হল এ সমাজে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। উঁচু-নিচু কোন বর্ণ বৈষম্য এখানে নেই। এ সমাজে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় তার আচার-আচরণ, শরী'আতের অনুশাসন অনুশীলন প্রভৃতির মাধ্যমে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় অমুসলিম জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে কোন বৈষম্য আরোপ করা হয় না। সমাজের একজন সদস্য এবং প্রতিবেশী হিসেবে ইসলাম তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও হিফাযত করে। ইসলামী সমাজে মুসলিম, অমুসলিম একে অপরের সাহায্য সহযোগিতায় পরস্পর মিলে-মিশে শান্তিতে বসবাস করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাকে ইসলামে গুরুত্বারোপ করেছে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাকে হত্যার চেয়েও জঘণ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। সর্বোপরি ইসলাম আদর্শ ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার সকল ন্যায়-নীতি উপহার দিয়েছে। একজন সাধারণ মানুষের প্রতিও ইসলামী সমাজে বেইনসাফী করা হয় না। তাছাড়া, সমাজের প্রতিটি মানুষের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মসজিদভিত্তিক হওয়ায় এর কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত।

আমরা যে সমাজে বসবাস করছি এ সমাজকে জাহিলি সমাজ বা বাইরে ইসলামী সমাজ যেনো আমি অভিহীত করি না কেন এ সমাজের শাখা প্রশাখা অনেক গভীরে গ্রথিত। শিক্ষা সংস্কৃতি অর্থনীতির শিল্প সাহিত্য কলা সকল ক্ষেত্রে জাহিদর্শন কাজ করছে।

★অধ্যায় ১: রাষ্ট্রসমাজ পরিচিতি

১.১: রাষ্ট্র সমাজ কি?

রাষ্ট্র একটি সামাজিক, রাজনৈতিক, বিশেষত বল প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন বর্বর জীবনের অবসান এমন সভ্যতার সোপান রচিত হয়েছে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তির মধ্য দিয়ে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বহিঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এমন জনসমাজই রাষ্ট্র অর্থাৎ স্বাধীন ও সার্বভৌম জনগোষ্ঠী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিকপাল **অ্যারিস্টোটল** তার বিখ্যাত গ্রন্থ **'The politics'**-এ বলেন, "পরিপূর্ণ ও স্বনির্ভর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র হচ্ছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমাজ, বা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বা স্বাধীন এবং যার একটি সরকার ব্যবস্থা রয়েছে যার প্রতি সব জনগণ অনুগত্য স্বীকার করে। রাষ্ট্র একটি বাস্তব ভৌগলিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মানব সমাজের রাজনৈতিক চেতনাপুর থেকে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র বৃহত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ জীবনের প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র নামক সংগঠন সৃষ্টি করেছে।

১.২: রাষ্ট্রের উৎপত্তি

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর মতানুসারে 'রাষ্ট্র মানুষের আগে আবির্ভূত হয়েছে' ("State is prior to the Individual')। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ আসার আগেই রাষ্ট্রব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার সূত্রপাত হয় অনেক আগে থেকেই। তবে মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রথম উপাদান পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের

উৎপত্তি সম্পর্কে মতামত প্রতিষ্ঠার এক বিশেষ উদ্যোগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা যায়। তারপর এ বিষয়ে আধুনিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রচলিত মতবাদগুলি হল:

- (১) ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ,
- (২) বলপ্রয়োগ মতবাদ,
- (৩) সামাজিক চুক্তি মতবাদ,
- (৪) পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং
- (৫) ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ।

এই মতবাদগুলিকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়: **(ক)** দর্শনমূলক বা কাল্পনিক মতবাদ (Speculative Theory) এবং **(খ)** ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ (Scientific Theory)। প্রথম তিনটি মতবাদ হল কাল্পনিক এবং পরের দুটি হল যথাক্রমে মানববৈজ্ঞানিক (Anthropological) ও ঐতিহাসিক।

এ মতবাদ সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বিস্তারিত রয়েছে। নবম-দশম শ্রেণি থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলো আলোচিত হয়ে থাকে এবং মনীষীগণ এতগুলো মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তন মূলক মতবাদই সর্বজনস্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ।

১.৩: রাষ্ট্র সমাজের ইতিহাস

রাষ্ট্র বলতে এমন এক রাজনৈতিক সংগঠনকে বোঝায় যা কোন একটি ভৌগোলিক এলাকা ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে। রাষ্ট্র সাধারণত একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক সীমার ভেতর বসবাসকারী সমাজের সদস্যদের শাসনের জন্য

নিয়ম-কানুন তৈরি করে। যদিও একথা ঠিক যে রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পাওয়া না পাওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে, রাষ্ট্র হিসেবে তার উপর প্রভাব রাখা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির উপর।

প্রাচীন কালে মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করা জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন 'মানুষ সামাজিক জীব'। মানুষ কখনো একা বাস করতে পারে না। মানবসভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষ একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে বা সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে সমাজের। কিছুসংখ্যক মানুষ একই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে বসবাসের নামই হলো রাষ্ট্রসমাজ।

১.৪: রাষ্ট্র সমাজের উপাদানসমূহ

কোন একক উপাদানে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হতে হলে উল্লেখিত সকল উপাদান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকতে হবে। কোন একটি উপাদানের কমতি হলে রাষ্ট্রকে বিকলাঙ্গ বলে মনে হয়।যেমন-পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীর সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌমত্ব কারণে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। রাষ্ট্র সম্পর্কে লেখক ও চিন্তাবিদদের প্রদত্ত সংখ্যাগুলো বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রের চারটি অপরিহার্য উপাদান পাওয়া যায়। যথা: (১) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩)স্থায়ী যৌন সমষ্টি, (৩)সরকার, (৪)সার্বভৌমত্ব

১.৫: রাষ্ট্রসমাজের গুরুত্ব

রাষ্ট্রেসমাজের পরিচয় কী, রাষ্ট্রসমাজ কী কাজ করে বা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি কী-এ সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্র হলো 'highest of all human associations'। মানুষের রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র এক অপরিহা সাক্তের রাষ্ট্রের মধ্যেই জনসমষ্টি আইনানুসারে সংগঠিত হয়, রাষ্ট্রকে সামনে রেখেই একটি জাতি নিয়মতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রিত্ব পথে তার যাত্রা শুরু করে। বার্জেস রাষ্ট্রের মধ্যে

দেখেছেন মানবজাতির সংঘবদ্ধ রূপ। ব্রন্টসলি বলেন, রাষ্ট্রই জনসমষ্টিকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করে। রাষ্ট্র হলো জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। ম্যাকাইভার হেগেলের মতো দেবত্ব আরোপ করে নয়, আবার ক্ষুদ্র উপেক্ষার দৃষ্টিতে নয়, রাষ্ট্রকে দেখেছেন রাষ্ট্র যা সেইভাবেই। তাঁর বক্তব্য, রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্গত, রাষ্ট্র সমাজ নয়। সমাজে মানুষের বাহ্য সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে রাষ্ট্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বাইরে রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। রাষ্ট্র নিজের অধিকারে সার্বভৌম নয়, মানুষের সম্মতি বা ইচ্ছা রাষ্ট্রিক সার্বভৌমিকতার ভিত্তি। দমন করে রাষ্ট্র আনুগত্য পেতে পারে না, মানুষের ইচ্ছাই আনুগত্যের উৎস।

রাষ্ট্র সম্পর্কে অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কারের বক্তব্যও কৌতূহলপ্রদ। বার্কার রাষ্ট্রকে কোনো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবেন না। তাঁর মতে রাষ্ট্র হলো একটি নির্দিষ্ট ও বিশেষ ধরনের সংস্থা যা একটি বাধ্যতামূলক আইনগত নিয়মব্যবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বার্কারের মতে একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের অর্থাৎ আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব। বার্কার বিশ্বাস করেন রাষ্ট্রের ভূমিকা বহুমুখী মনে হলেও একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে (আইন ও মানুষের বাহ্য আচরণ) এর এক্তিয়ার নেই। কার্যকলাপের একটি বিরাট এলাকা রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থিত। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি রাষ্ট্র সম্পর্কে আইনগত ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট নন। একথা হয়তো ঠিক রাষ্ট্র সমাজসৌধের চূড়া, রাষ্ট্রের পরিচয়ই ব্যক্তির পরিচয় আইনকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের অধিকার রাষ্ট্রের আছে, কিন্তু রাষ্ট্রকে, ঘটনাবলির আলোকে। রাষ্ট্র সম্পর্কিত তার উপস্থিতিকে বুঝতে হবে ইতিহাসের আলোচনাকে দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করে লাস্কি বলেছেন, রাষ্ট্রের তাৎপর্য বিচার্য রাষ্ট্র কী পরিমাণে মানুষের কার্যকর দাবি প্রতিফলিত করে তার উপর। রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার কার্যাবলি বিচার করেও চরিত্র নির্ধারণ করা সম্ভব। চূড়ান্ত বিচারে লাস্কি রাষ্ট্রকে দাঁড় করিয়েছেন তার উদ্দেশ্যের পটভূমিতে। রাষ্ট্র কী করতে চায়, বাষ্ট্র মানুষের দাবি বা অভাব পূরণে কতটা সমর্থ এগুলো রাষ্ট্রকে বিচার করার প্রকৃত মাপকাঠি।

★অধ্যায় ২:আধুনিক রাষ্ট্রসমাজ

২.১: আধুনিক রাষ্ট্রসমাজ

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় আধুনিক রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টি যারা কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন নিজস্ব সরকারের অধীনে বসবাস করে। আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম দিকপাল ম্যাকিয়াভেলি সর্বপ্রথম তার দর্শনে রাষ্ট্র কথাটি উল্লেখ করেন।

একটি রাষ্ট্র যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এবং একটি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত অঞ্চলের উপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রয়োগ করা হয় । আধুনিক রাষ্ট্রগুলি একটি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দ্বারা শাসিত হয়।

ক্রিস্টোফার পিয়ারসন তার Modern State গ্রন্থে আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা দেন। তার মতে, জনগণ চায় তাদের জন্ম,মৃত্যু, বিবাহ নিবন্ধন হোক,তাদের সন্তানের শিকার দায়িত্ব সরকার নিক, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন দিক,বহিস্থ আক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষা করুক ইত্যাদি। আর এসব প্রয়োজনেই উদ্ভব আধুনিক রাষ্ট্রের।

২.২: আধুনিক রাষ্ট্রসমাজের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্র হল ‘highest of all human associations’।রাষ্ট্রকে সামনে রেখেই একটি জাতি নিয়মতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রিত পথে যাত্রা শুরু করে। বার্জেস রাষ্ট্রের মধ্যে দেখেছেন মানবজাতির সংঘবদ্ধ রূপ।

এ্যারিষ্টট প্রাচীনকালের একজন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেছেনঃ“রাষ্ট্র একটি স্বভাবগত কার্যক্রম। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক জীব। যে মানুষ সমাজ-বহির্ভূত জীবন যাপন করে, যার জীবন কোন নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন নয়- নিঃসন্দেহে

বলা যায়, সে হয় মানবেতর জীব, না হয় মানব-প্রজাতি ঊর্ধ্ব কোন সত্তা, যার মধ্যে মানবীয় প্রকৃতির কোন অস্তিত্ব নেই।”[রাজনীতি]

প্লেটোও প্রাচীন প্রখ্যাত দার্শনিকদের একজন। তিনি মনে করেনঃ“রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনতা ব্যতিরেকে উন্নত মানের জীবন লাভ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। কেননা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে রাজনীতি- তথা রাষ্ট্রীয় তৎপরতার দিকে। মানুষ তার এ স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে কখনো মুক্ত হতে পারে না।”[গণপ্রজাতন্ত্র]

- জনগণের নিরাপত্তা প্রদান করা: **রাষ্ট্রের** প্রধান কাজ হল জনগণের নিরাপত্তা প্রদান করা। ...
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা: **রাষ্ট্রের** অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ...
- সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণ নিশ্চিত করা: **রাষ্ট্রের** কাজ হল জনগণের জন্য সামাজিক ন্যায় এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা।

২.৩: আধুনিক রাষ্ট্রসমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৯৭৫ সালে চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই একটি রাষ্ট্র আধুনিক হওয়ার পিছনে চারটি ভিত্তির কথা বলেন। অর্থাৎ নিম্নোক্ত চারটি ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্র আধুনিক ;তারাই আধুনিক রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হবে।

ক) শিল্প খ) কৃষি গ) সামরিক ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাত।

রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য/রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান: রাষ্ট্র সম্পর্কে গার্নারের দেওয়া সংজ্ঞা থেকেই রাষ্ট্রের চারটি অপরিহার্য উপাদান বা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল—[i] জনসমষ্টি, [2] নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, [3] সরকার ও [4] সার্বভৌমত্ব।

★অধ্যায় ৩:রাষ্ট্রসমাজ পরিচালনার মূলনীতিসমূহ

রাষ্ট্রসমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কতিপয় মূলনীতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর এ মূলনীতি অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে থাকে। সংবিধান ও অন্যান্যা আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি সমূহ নির্দেশক হবে। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হবে, তবে সকল মূলনীতি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য হবে না।

৩.১: জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ যেখানে জাতিকে মানব সমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থাপন করা হয় এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে জাতিগত আদর্শের পরে স্থান দেয়া হয়। জাতীয়তাবাদ একটি জাতির সংস্কৃতি রক্ষার্থে ভূমিকা পালন করে এবং জাতির অর্জনসমূহকে সামনে তুলে ধরে।

৩.২: সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি

মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩.৩: গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

৩.৪: এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে না। কাউকে ধর্ম পালনে বাধ্য করা হবে না।

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ সংবিধান)

★অধ্যায় ৪: ইসলামিক রাষ্ট্রসমাজ

মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি।ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয় এমন রাষ্ট্রকে, যে রাষ্ট্র ইসলামের নীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত হয়।

৪.১: ইসলামি রাষ্ট্রসমাজের পরিচয়

যে রাষ্ট্রে মহান আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব, আধিপত্য ও আইন প্রতিষ্ঠিত। সকল মানুষ সমানভাবে আল্লাহর বান্দা হওয়া ও তাঁর নিকট সকলেরই দায়ী হওয়ার সুস্পষ্ট স্বীকৃতির ওপর যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।

অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের পরিচালনা, নীতি-নির্ধারণ, প্রশাসন ও আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতি-নীতির পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রকে বলা হয় দারুল ইসলাম) دار الإسلام(। এ পরিভাষা অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র হলো 'দারুল ইসলাম' বা 'ইসলামের রাজ্য'। মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, মনীষী ও ফিকহবিদগণ ইসলামী রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানে 'দার' শব্দটি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'রাষ্ট্র' বা এরই সমার্থক। ফিকহবিদগণ দারুল ইসলামের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন-

ار الإسلام اسم للموضع الذى يكون تحت يد المسلمين

"দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র হল এমন ভৌগোলিক অঞ্চলের নাম যা মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে।

এ সংজ্ঞায় কতিপয় বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যা একটি রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। যথা একটি ভূখন্ড, অধিবাসী এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ। মুসলিমদের কর্তৃত্বাধীন বলে রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আর তাহল ইসলামী আদর্শ। কেননা একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুসলমানগণ আল্লাহ, রাসূল এবং কুরআন-সুন্নায় বিশ্বাসী বলে তারা যখন পৃথিবীর কোন ভৌগোলিক এলাকায় শাসন কর্তৃত্ব স্থাপন করে, তখন তারা ইসলামী আদর্শ ও বিধান মুতাবিকই যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে। আর এটাই সাধারণ দাবি।

ইমাম শাফেঈ (র) এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেন-

"ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর মুসলমান হওয়া শর্ত নয়, বরং রাষ্ট্র ক্ষমতা মুসলমানদের নেতার হাতে থাকা এবং তাকে ইসলামী বিধান মেনে চলাই যথেষ্ট।"

তার মানে নিশ্চয় এ নয় যে, ইমাম শাফেঈর মতে অমুসলিম নাগরিকের ওপরও ইসলামী আইন জারি হবে। তার কথার তাৎপর্য হলো, একটি রাষ্ট্রকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' বলে আখ্যায়িত করার জন্য রাষ্ট্র-শাসকের মুসলিম হওয়া ও ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র শাসন করাই প্রথম শর্ত। এটা হয়ে গেলেই তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে।

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড ইসলামী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়, আল্লাহ রাববুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মুতাবিক লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।"

ইবনে খালদুনের মতে- "ইসলামী শরী'আতের দাবি অনুযায়ী নাগরিকদের ইহজাগতিক ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের সর্বাধিক দায়িত্ব গ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনই হল ইসলামী রাষ্ট্র।"

ইবনে তাইমিয়া (র) বলেনঃ "ইসলামী রাষ্ট্র হল ধর্মভিত্তিক এমন প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে সকল আইন প্রয়োগ করা যায়।"

সাইয়েদ রশিদ রিদা বলেনঃ "ইসলামী রাষ্ট্র এমন এক ধর্মতন্ত্র যা ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে।"

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ **শামসুল আলম** বলেন: আলকুরআন এবং সুন্নাভিত্তিক সংগঠিত এবং পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে- "যে ভূ-খন্ডের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং শাসক ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।"

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বলেনঃ "কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত নীতিমালার আওতাধীন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।"

আধুনিক ইসলামিক চিন্তাবিদদের মতেঃ "যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠে-যদি তা কুরআন, সুন্নাহ-এর ভিত্তিতে তৈরি হয় তাহলে সে রাষ্ট্রকে বলা হবে ইসলামী রাষ্ট্র।"

মূলতইসলামের মূল দর্শনের আলোকেই গড়ে উঠে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক অগ্রগতি ও মর্যাদা, প্রসার ও ব্যাপ্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির দায়িত্বে নিয়োজিত সংগঠনটির নাম হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র।"

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

৪.২: ইসলামী রাষ্ট্রসমাজের গুরুত্ব

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে নিয়ে ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। তবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে ইসলামে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থাসহ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছাড়া সকল দেশের সকল সমাজের মানুষদের জন্য পালনীয় প্রশস্ততা রয়েছে ইসলামে। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে মুমিনের ধর্ম পালনের জন্য শর্ত বা মূল বিষয় বলে গণ্য করা হয় নি। রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের একটি অংশ। ইসলামে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে।যেখানে জনগণ ইনসাফভিত্তিক জীবন পরিচালনা করে।

সুতরাং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা ও যথাযথ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

৪.৩: ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃতি

ইসলাম সর্বকালে, সর্ব যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্য স্থায়ী জীবন ব্যবস্থা এবং বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন ধর্ম। কুরআন, হাদিস ও সাহাবীদের জীবন উপকরণ দেখলে আমরা এ দুটি বিষয় খুব ভালোভাবেই লক্ষ্য করি যে যুগ, সমাজ, সামাজিক রীতি ও আচার-আচরণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইসলামের ধর্মীয় রূপের পরিবর্তন না আসে এবং যুগ সমাজ-সামাজিক রীতি ও, আচার-আচরণের ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণে ইসলামের আহকাম পালনে কারো অসুবিধা যেন না হয়। সকল যুগের সকল ধার্মের মানুষ যেন খুব সহজে ইসলামে আসতে পারে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারে।

এ দুটি বিষয়ের ভিত্তিতে ইসলামে মানব জীবনের কর্মকান্ডকে মূল দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) ইবাদাত ও (২) মুআমালাত। মানুষকে জীবন ধারণ করতে জাগতিক ও জৈবিক প্রয়োজনে যা করতে হয় এবং বিশ্বাসী-অবিশ্বাস ও ধার্মিক-অধার্মিক সকলেই যা করেন তা মুআমালাত বা জাগতিক কর্ম বলে গণ্য। আর জাগতিক প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে

শুধু মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যে কর্ম করে তা ইবাদত বলে গণ্য। নিম্নে ইসলামিক রাষ্ট্রসমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো -

১.রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস নাগরিকদের পরামর্শ : কুরআন কারীম ও হাদিসের মুমিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরামর্শ প্রদানে উৎসাহিত করা হয়েছ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর জীবনে তাকালে দেখা যায় য, তিনি তার সকল সিদ্ধান্ত সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে গ্রহণ করেছেন

মহান আল্লাহ মুমিনদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দিয়েছে, সালাত কায়েম করেছে, তাদের কর্ম তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শভিত্তিক এবং তাদেরকে যা রিযকপ্রদান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।"

—সূরা শূরা :৩৮

কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা যে সংশিষ্ট সকলেই পরামর্শ প্রদান করবেন। নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধারণ-অসাধারণ সকলের পরামর্শ গ্রহণ এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। কাউকে বাদ দেওয়ার কোনোরূপ নির্দেশনা নেই। যদি কেউ পরামর্শ দেন ও অন্যরা মেনে নেন তাহলেও অসুবিধা নেই।

২.রাষ্ট্রের মালিকান জনগণ- মালিকানা দু প্রকারের। সকল কিছুর প্রকৃত মালিকানা মহান আল্লাহর। তিনিই মালিক, রাজা বা sovereign । পাশাপাশি জাগতিকভাবে মানুষকে দুনিয়াতে তার সম্পদের মালিকানা প্রদান করা হয়েছে এবং মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের।

ইসলামে রাষ্ট্রের মালিকান নাগরিকগণের। নিজের মালিকানাধীন জমিন যেমন মুমিন আল্লাহর নির্দেশের আওতায় নিজের প্রয়োজন, সুবিধা ও ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও সম্পদ আল্লাহর নির্দেশের আওতায় থেকে নিজেদের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে ব্যবহার করবেন।

৩.শাসকের কোন অভ্রান্ততা বা পবিত্রতা নেই- ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক কখনোই আল্লাহর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত (successor/vicar) নন। অন্য সকল মানুষের মতই তিনি আল্লাহর বিধান ও ব্যবস্থার অধীন। মহান আল্লাহ রাষ্ট্র পরিচালনা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যে মূলনীতি প্রদান করেছেন তা পালন করতে তিনি বাধ্য। রাষ্ট্রপরিচালনা বিষয়ে ইসলাম কিছু মূলনীতি দিয়েছে, যেগুলির মধ্যে রয়েছে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা, জীবন, জীবিকা, ধর্ম, বাসস্থান ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করা, বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, অপরাধীর সঠিক শাস্তি নিশ্চিত করা ইত্যাদি। বিচার ও শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলামে কিছু শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলি সমাজের অপরাধ দমন করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে। অন্যান্য অপরাধে শাসক, সরকার বা প্রশাসন প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এ সকল মূলনীতি ও বিধিবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং ইসলামের নির্দেশনার ব্যাখ্যা প্রদানে শাসকের নিজস্ব কোনো পবিত্রতা বা অভ্রান্ততা নেই। জনগণের শাসনে, নির্দেশ দানে বা আল্লাহর বিধানের ব্যাখ্যায় তাঁর নিজের মতের কোনো বিশেষ মূল্য নেই। তার ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত ভুল বলে মনে হলে যে কেউ তার সমালোচনা এবং ভুল সংশোধন করতে পারেন।

(তথ্যসূত্র: ড.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উইকিপিডিয়া)

<u>৪.৪:</u> ইসলামি রাষ্ট্রসমাজের তাৎপর্য

সাধারণত মনে করা হয় ইসলাম একটি ধর্ম মাত্র এবং ইসলামী শরিয়ত কেবলমাত্র নৈতিক চরিত্র ও আল্লাহর সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম-বিধানই পেশ করে। এ ছাড়া মানবজীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইসলামের কিছুই বলার নেই। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলাম একেবারেই নীরব এবং সে পর্যায়ে মুসলমানরা যেকোনো নীতি বা আদর্শ গ্রহণে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

শরিয়তের নির্দেশ পালন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা : তা ছাড়া শরিয়তের এমন অনেক আইন-বিধান রয়েছে যা কার্যকর করতে হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা না করে সেগুলোর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের পরস্পরের বিচার-ফয়সালা করার এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে কুরআন-হাদিসে। কিন্তু রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ না করবে ততক্ষণ কোনো ব্যক্তি বা সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষে তা করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এ জন্যই জনগণের উপর কোনো কিছু কার্যকর করার ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা একান্তই জরুরি। এ পর্যায়ের যাবতীয় হুকুম-বিধানের প্রকৃতিই এমনি। এ কথাটি বোঝাবার জন্যই ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, জনগণের যাবতীয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করা-রাষ্ট্র কায়েম করা দ্বীনের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। বরং রাষ্ট্র ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না। আরো কথা এই যে, আল্লাহ তায়ালা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি জিহাদ, ইনসাফ ও আইন-শাসন প্রভৃতি যেসব কাজ ওয়াজিব করে দিয়েছেন তা রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ছাড়া কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না (আস-সিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ, পৃষ্ঠা-১৭২-১৭৩)।

অতএব, শরিয়তের আইন-বিধান জারি ও কার্যকর করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা একটি অপরিহার্য জরুরি কর্তব্য। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র জরুরি : কথা এখানেই শেষ নয়। আল্লাহর ইবাদতের দায়িত্ব পালনের জন্যও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে তাঁরই ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে (সূরা আয যারিয়াত : ৫৬)। কুরআনের এই ইবাদত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। আল্লাহ তায়ালা যেসব কথা, কাজ-প্রকাশ্য বা গোপনীয়-ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদত শব্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে মানুষের যাবতীয় কথা, কাজ ব্যবহার প্রয়োগ, আয়-ব্যয় ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধ- এক কথায় মানুষের সমগ্র জীবন ইসলামী শরিয়ত নির্ধারিত পথ ও পন্থা এবং নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী সুসম্পন্ন

হওয়া কর্তব্য হয়। তা যদি করা হয় তাহলেই আল্লাহর মানব সৃষ্টি সংক্রান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সার্থক হতে পারে। অন্যথায় মানুষের জীবনে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না, আল্লাহর উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে মানবজীবন ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু ইসলামী সমাজ গঠন করা কিভাবে সম্ভব? তা কি শুধু ওয়াজ-নসিহত বক্তৃতা-ভাষণেই কায়েম হতে পারে? না তা সম্ভব নয়। সে জন্য প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। কুরআনকে গ্রহণ করা মানবরচিত পাঠ্যপুস্তকের বাইরে।

★অধ্যায় ৫: আল কুরআন

মহাগ্রন্থ আল কুরআন। স্রষ্টার মহাদাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর শ্রেষ্ঠ মোজেজা, বান্দার জন্য রহমতের ভান্ডার। সর্বোপরি বিশ্ব মানবতার মুক্তির মহাসনদ। কুরআন এমন একটি কিতাব যা তেলাওয়াত করলেও সওয়াব, শুনলেও সওয়াব, শিখলেও সওয়াব, শেখালেও সওয়াব, আমল করলেও সওয়াব, কাউকে আমল করতে উৎসাহিত করলেও সওয়াব।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی وَالۡفُرۡقَانِ ۚ ১৮৫

রমাযান মাস- যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকেদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে,

___সূরা আল বাকারাহ:১৮৫

আল্লাহর কালাম। কালামুল্লাহ। এর চেয়ে বড় আর কোনো সংজ্ঞা হতে পারে না। এর পুরোটাই আমার রবের কথা। দুনিয়ার সব বইতে মানুষের কথা। **আল কুরআন** একমাত্র ব্যতিক্রম। এটা শুধু মাত্র আমার রব আল্লাহ তা'য়ালার কথা, আর কারো কথা নেই। অন্যদের কথা আছে তবে সেটা আমার রবের নিজস্ব কালামে।

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন। যা সমগ্র মানবজাতির হেদায়েতের জন্য মহান রব্বুল আলামীন জিবরাইল আ: এর মাধ্যমে তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ সাঃ এর কাছে দীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে, প্রয়োজন মোতাবেক অল্প অল্প করে নাযিল করেছেন। ভাষা এবং ভাব উভয়ই আল্লাহর থেকে আগত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন’

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ الۡقُرۡاٰنَ تَنۡزِيۡلًا ۚ ٢٣

হে নবী!) আমি তোমার কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে (অল্প অল্প করে)।

___সূরা আল ইনসান:২৩

এটা এমন এক কিতাব যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে। যার সংস্পর্শে আলোকিত হয় এই ধরা। পৃথিবীতে একমাত্র ঐশ্বরিক গ্রন্থ এ কুরআন যাতে কোন রকম সন্দেহ নেই এবং যা কেবলমাত্র মানবজাতির হেদায়েতের জন্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَيۡبَ ۛۚ فِيۡهِ ۛۚ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ۙ(٢)

ইহা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; ধর্ম-ভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ পথনির্দেশ।___সূরা বাকারাহ:০২

কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার ভাষা ও সাহিত্য মান অনেক উঁচু। এর সমান আর কোন গ্রন্থ নেই। কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির পথনির্দেশ এই পবিত্র গ্রন্থ। আল্লাহ বলেন’

وَاِنَّهٗ لَتَذۡكِرَةٌ لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ٤٨

মুত্তাকীদের জন্য এ কুরআন অবশ্যই এক উপদেশ,___সূরা আল হাক্কাহ:৪৮

<u>৫.১:</u> কুরআন নাযিলের কারণ

قُلۡنَا اهۡبِطُوۡا مِنۡهَا جَمِيۡعًا ۚ فَاِمَّا يَاۡتِيَنَّكُمۡ مِّنِّىۡ هُدًى فَمَنۡ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ٣٨

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَكَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ٣٩

আমি বললাম, 'তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও, পরে যখন আমার নিকট হতে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'। আর যারা কুফরী করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।___ সূরা বাকারাহ:৩৮-৩৯

উক্ত আয়াতটি আল্লাহ সুবনাহুতা'য়ালা আদম ও হাওয়া আ: এবং ইবলিশ কে জান্নাত থেকে বের করার সময় বলেন। পৃথিবীতে কিতাবাদী ও নবী রাসূলগণকে পাঠানো হবে, অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করা হবে,দলিল প্রমাণাদি বর্ণিত হবে,সত্যপথ প্রকাশ করে দেওয়া হবে এবং মুহাম্মদ সাঃ কেও পাঠানো হবে ও তাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করা হবে। আর যারা নিজ নিজ যুগের নবী রাসূলকে অনুসরণ করবে, পরকালে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং দুনিয়া নিয়েও তাদের কোন চিন্তা থাকবে না। অর্থাৎ মানবসমাজ,রাষ্ট্রসমাজ, সমগ্র সৃষ্টিজগত কুরআন এবং নবী রাসূলগনের নির্দেশিত পথে চলবে।

এই কুরআনে রয়েছে ___

১.সব সমস্যার সমাধান

২.সমস্ত রোগের উপশম

৩.মুসীবতের মুসকিল আসান

৪.সব বিচ্যুতির সংশোধন

৫.সব গোমরাহির হিদায়ত

৬.সব অন্ধকারের আলো

৭.সব জটিলতার ব্যাখ্যা

(আই লাভ কুরআন, পৃ:৩৪-৩৫)

৫.২: কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য

১.সঠিক পথ নির্দেশনা-কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ,রহমত ও সুসংবাদ ঘোষণা এবং দিশেহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দানের নিমিত্তে আল্লাহ তায়ালা আল কুরআন অবতীর্ণ করেন।

২.সমস্যার সমাধান-বিশ্ব মানবতা যখন চরম সংকটে। জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত মানব সভ্যতা। ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা আল কুরআন নাযিল করে মানুষকে এই সংকটময় মুহূর্ত থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলে দেন। আল কুরআন যাতে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান।

৩.সতর্কবার্তা প্রদান-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে পূর্ববর্তী শক্তিশালী জাতিসমূহের অবাধ্যতা এবং তাদের অবাধ্যতার কারণে নির্মম পরিণতির কথা স্মরণ করার মাধ্যমে মানব সমাজকে সতর্কতা প্রধানের নিমিত্তে আল কুরআন অবতীর্ণ হয়।

৪.ভ্রান্তি ও বিশ্বাসের অপনোধন- ইসলাম পূর্ব মানব সমাজ বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করতো। নিজেদের ইচ্ছামতো মূর্তি গরন করে তাকে সর্বশক্তিমান এর আসনে বসাত। নানা অপরাধ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল তাদের সেই জীবন। তাদের সে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা খন্ডনের নিমিত্তে কুরআন অবতীর্ণ হয়।

৫.ইসলামিক সমাজের রূপরেখা প্রণয়ন- মানব রচিত সকল বিধি-বিধান উৎখাত করে একমাত্র কুরআনী আইন কায়েম করাই হচ্ছে কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য।

৬.শিরকমুক্ত সমাজ গঠন- আল কুরআন নাযিলের পূর্বে মানব সমাজ ছিল জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত, শিরক, কুফর নিফাকের মতো জঘন্যতম অপরাধে আচ্ছন্ন থাকতো সে অন্ধকারময় সমাজ। কোরআন সেই বিশ্ব মানব সমাজের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য পথ নির্দেশক হিসেবে নাযিল হয় ।

৭.ইনসাফ প্রতিষ্ঠা- অন্যায় জুলুম অত্যাচার খুন এবং নানা সামাজিক অপরাধে জর্জরিত ছিল জাহিলিয়াত সমাজ ব্যবস্থা। আর এই সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হওয়া ছিল খুব জরুরী । কুরআন নাযিলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৮.রবের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন- প্রতিটি মুমিনেরই অন্তরের গোপন আকাঙ্ক্ষা থাকে তার রবের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়। তার রবের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং তার রবের সাক্ষাৎ লাভ। কুরআনে কামনা পূরণের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে।

৯.সত্যায়নকারী- সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব হচ্ছে আল কুরআ। আল কুরআন তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলগণের আনীত বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছে।

১০.তাজকিয়ায়ে নাফস- সর্বোপরি দুনিয়ার সকল কার্যক্রমে বান্দার আত্মশুদ্ধির এক কার্যকর ঔষধ হিসেবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

৫.৩: কুরআনী রাষ্ট্রসমাজের প্রয়োজনীয়তা

কুরআনী সমাজ মানে আল্লাহর ওহীর দিক নির্দেশনার আলোকে সমাজ পরিচালিত হব। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর হেদায়েতের অনুসরণ এর বিকল্প নেই। আল্লাহর রাসূল হিলফুল ফুজুল করেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। হেরা গুহায় ধ্যান করেছিলেন। ওহী দিয়ে ২৩ বছরের শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন সুন্দরী রমণী ঘর থেকে একাকী বের হতে পারতো। যাকাত নেওয়ার মতো লোক ছিল ন। হযরত আব্দুল আজিজ ছেলেকে রাষ্ট্রীয় তহবিলের একটি খেজুর দেননি আল্লাহর ভয়ে। ব্যক্তিগত কথা বলার সময় রাষ্ট্রীয় অর্থের বাতি নিভিয়ে রাখতেন।কুরআনী সমাজ ছাড়া এমন সুখ পাওয়া যায় না।

তাই রাষ্ট্র সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কুরআনী সমাজ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অপরিহার্য।

৫.৪: কুরআনী রাষ্ট্রসমাজের বৈশিষ্ট্য

কুরআনী সমাজ মানে আইন হবে আল্লাহর। জনগণের পরিবর্তে সার্বভৌমত্বের মালিক হবেন আল্লাহ। রাষ্ট্র ইসলামের চিন্তাবিদদের ইতিহাসের আলোকে বিস্তারিত আইন কানুন করবে। মানব রচিত আইন প্রণেতারা সুদূরপ্রসারী ভালো-মন্দ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। কারণ তারা গায়েব জানেন না। ভবিষ্যতে মানব সমাজের সুখ কিসে নির্ভর তার তিনি বলতে পারেন; যিনি আলেম আল-গায়েব।

পাঠ্যপুস্তকের আলোকে কোরআনী সমাজের এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় ঐশ্বরিক মতবাদ। যাকে অধিকাংশ মানব দার্শনিক ভুল বলে প্রমাণিত করেছেন তারা এটাকে ভিত্তিহীন মতবাদ বলে ব্যক্ত করেছেন। তবে রাষ্ট্র সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কুরআনিক সমাজের ভূমিকা অনেক।

কুরআনী সমাজ মানে রাষ্ট্রের সর্বত্র আদল তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। রাষ্ট্রনায়ক আইনের উর্ধ্বে থাকবেন না। বর্তমান প্রচলিত আইনের রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্ব পালনকালে আইনের উর্ধ্বে। ধরাছোঁয়ার বাহিরে। যদিও বর্তমান রাষ্ট্রসমাজ জনগণের শাসনকে সর্বাধিক গ্রহণ করা হয়েছে, এটাকেই প্রকৃত মতবাদ বলা হয়েছ, তবে রাষ্ট্রনায়ক জনগণের কাছে তার কাজের জবাবদিহি করেন না।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু এর সাথে ইহুদীদের মীমাংসার জন্য খলিফা আদালতে গিয়েছিলেন। আদালত প্রভাবিত করেননি। রাষ্ট্র মানুষের উপর কোন জুলুম করবে ন। এক মানুষ আরেক মানুষের উপর জুলুম করা থেকেও বিরত থাকবে ।

কুরআনী সমাজ মানে সমাজের সকল মানুষ নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। রাষ্ট্রনায়করা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলে তাদের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকরা চেষ্টা করবে।

কুরআনী সমাজ মানে সে সমাজে কেউ দুনিয়ার কোন সত্তাকে ভয় পাবে ন। একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ইসলামের সৌর্য বীর্য বিসর্জন দিবেনা, প্রয়োজনে শাহাদাত বরণ করবে।

কুরআনী সমাজ মানে আমাদের দেখা সমাজ ব্যবস্থা নয়। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে গণতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাও নয়। এমন শাসনব্যবস্থা নয় যেখানে জনগণ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। জনগণের বাক স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হবে।

কুরআনী সমাজ মানে সে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে পরামর্শ ভিত্তিক। ক্ষমতাশীলরা স্বেচ্ছাচারী হবেন না।

জনগণ আল্লাহর আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করব। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় রাষ্ট্র সমাজ পরিচালিত হবে। জনগণের হক যথাযথ আদায় হবে। রাষ্ট্রনায়ক তার সকল কাজের জন্য আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

★অধ্যায় ৬: রাষ্ট্র ও কুরআনের মধ্যে সম্পর্ক

রাষ্ট্র মানব জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয়। দুনিয়ায় মানুষের স্থিতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক। অন্তত মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন যে রাষ্ট্র ছাড়া চলতে পারে না।

তবে কোন্ ধরনের রাষ্ট্র মানুষের জন্যে সত্যিকারভাবে কল্যাণকর, সে বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। রাষ্ট্র যেখানে মানুষের প্রয়োজনে অস্তিত্ব লাভ করেছে, সেখানে রাষ্ট্রের যুপকাষ্ঠেই মানবতাকে বারবার বলি দেয়া হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বহুতর ক্ষেত্রেই মানুষের জন্যে আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে। ইসলাম মানুষের জন্যে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা। রাষ্ট্র এ জীবন-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের প্রধান উৎস আল-কুরআন মানুষকে শুধু কতিপয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং মানুষের সমাজবদ্ধ

জীবনের জন্যেও দিয়েছে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা। এই দিক নির্দেশনাতেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে দেশ-কাল-নির্বিশেষে মানুষের জন্যে কল্যাণকর এবং গতিশীল রাষ্ট্র এক অনবদ্য চিত্র। ইসলাম নির্দেশিত এই রাষ্ট্র কোন অবাস্তব কল্পনা-বিলাস নয়, বিশ্ববাসী এর বাস্তব নমুনা প্রত্যক্ষ করেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্রই যে মানব জাতির জন্যে অফুরন্ত আশীর্বাদ বয়ে আনতে সক্ষম, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তারও সাক্ষ্য-প্রমান লিপিবদ্ধ রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে।

নবী জীবনে তাকালে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জ্বল জ্বল করে। হিজরতের পরে সর্বপ্রথম মদিনায় রাষ্ট্র গঠিত হয় কুরআনের আলোকে এবং সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে শান্তি ও ভালোবাসার পয়গাম ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ইসলামি খিলাফত,উসমানীয় সাম্রাজ্য সকল রাষ্ট্রই কুরআনিক শাসনে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

সুতরাং বলাই যায়, রাষ্ট্রসমাজ ও কুরআনের সম্পর্ক ওতোপ্রোতোভাবে জরিত।

★অধ্যায় ৭:রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি

বলা হয়ে থাকে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটা শিক্ষিত জাতি দ্রুতই উন্নতির শিখরে আহরণ করতে পারে। তাই জাতিকে উন্নতির দিকে অগ্রবর্তী করতে মানবরচিত পুস্তিকা পাঠ করানো হয় যাতে করে রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তিত হয়। তবে এই মানবরচিত -ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা পাঠ্যপুস্তক রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে তা আমরা পাঠ্যপুস্তকগুলোর দিকে তাকালেই দেখতে পাবো।

আল কুরআন একমাত্র ঐশ্বরিক বাণী। যাতে কোন সন্দেহ নেই। আল কুরআন কোন মানবরচিত গ্রন্থ না,স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা নিজস্ব কালামে রচিত গ্রন্থ। আল কুরআনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমাজের দিকে তাকালেই দেখা যায় একটা রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কুরআন কতটা ভূমিকা রাখে।

তাই নিম্নে রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

৭.১: ধর্মনিরপেক্ষতা

Secularism এর বাংলা প্রতিশব্দ ধর্মনিরপেক্ষতা। The Oxford study dictionary তে secular এর অর্থ করা হয়েছে not involving or belonging to religion. এক কথায় যার অর্থ ধর্মহীনতা। Secularism এর অনুবাদ 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' হওয়াটা মূলত এক ধরনের ষড়যন্ত্রের প্রামাণ্য দলিল। কারণ ধর্মের উপর নির্ভরতা না থাকার নামই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষত। ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ **যার ধর্ম তার কাছে** একথা মোটেও ঠিক নয়। পাঠ্যপুস্তকে তারা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এটাই শিখায় মানবতার ভুলি আওড়ায় কোনো ধর্মকে ছোট করা, আঘাত করা যাবে না। আসলে কি ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে পাঠ্যপুস্তকে তাই বুঝায়? না, এর অর্থ ধর্মহীনতা এটা বললে মুসলমানরা এটাকে গ্রহণ না করে এর মুখে থুতু নিক্ষেপ করব। সেজন্য অত্যন্ত চালাকি করে চমকদার মোড়কে Secularism শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছ। তবে কি কুরআন অন্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছ? দেশে দেশে হাঙ্গামা করতে বলেছ? তাদের এই ধর্মনিরপেক্ষতার বুলিতে এরকম প্রশ্ন আসাটা অস্বাভাবিক নয় তবে এ সম্পর্কে কুরআন কি বলেছ?? সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন,

لَاۤ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِۙ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الۡغَىِّۚ فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَيُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسۡتَمۡسَكَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ‏ ٢٥٦

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই।"(২৫৬)

এখানে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন কাউকে জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করো না ইসলামের সত্যতা প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে এবং ওর দলিল প্রমাণাদি বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে সুতরাং জোরজবরদস্তি কি প্রয়োজন।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করে করেন,

لَـكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِىَ دِيۡنِ ٦

"তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন। "অর্থাৎ যে যার দ্বীন পালন করবে এবং তাদের কর্মফলের হিসাব দিবে ।

তবুও তাদের যত ষড়যন্ত্র ইসলামকে নিয়। ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ইসলামের শত্রুতে পরিণত করছে অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -"কোন মুসলমান যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার ক্ষুন্ন করে কিংবা তাদের উপর জুলুম করে তবে কিয়ামতের দিন আমি মোহাম্মাদ ওই মুসলমানের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে লড়াই করব। "(সুনানে আবু দাউদ:১০৫২)

পাঠ্যপুস্তক আমাদের সভ্য নয় বরং ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি করে। সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য পাঠ্যপুস্তক নয় বরং কুরআন ভূমিকা রাখে। পাঠ্যপুস্ত কখনোই রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ভূমিকা রাখেনা, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নাম নিয়ে ধর্মহীনতা শেখানো হয় ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতার উদ্বেগ ঘটানো হয় সেখানে কি করে রাষ্ট্র সমাজ পরিবর্তন করতে পারে? কি করে রাষ্ট্রকে উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে নিয়ে যাওয়া যায়।

আল কুরআন যার আবির্ভাব ঘটেছিল আরবে ভয়াবহ এক নৈতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ের কালে। তখন আরবে লোকেদের আতিথ্যের সুনাম আর উন্নততর কাব্য রচনার পারদর্শিতা ছাড়া উল্লেখ করার মতো আর কোনো মানবিক বা সামাজিক গুনাবলী ছিল না। সে অবস্থা থেকে মাত্র ২৩ বছরের শুধু আরব নয় সারা বিশ্বের রং বদলে যায়।

বর্তমান রাষ্ট্র সমাজে কেন এতো অপরাধ প্রবণতা তাও আমরা কুরআন থেকেই পাই। আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِيۡنَ يُحَآجُّوۡنَ فِى اللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا اسۡتُجِيۡبَ لَهٗ حُجَّتُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ وَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٌ وَّلَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌ ١٦

"আল্লাহর দ্বীন মেনে নেওয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয় তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আজাব। "(সূরা আশ শূরা -১৬)

ধর্মনিরপেক্ষ তার নাম নিয়ে আমরা দিন থেকে সরে গেছি ভিন্ন ছাচে রাষ্ট্রকে সাজাতে গিয়ে নিজেদের করুন অবস্থায় নিয়ে এসেছ। আর এ পরিবর্তন আমাদের উন্নত নয় বরং অনুন্নতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৭.২: সুদ বনাম যাকাতেট হিসাব

◆ সুদ কি?

পাঠ্যপুস্তক এর পরিভাষায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে টাকা ধার নিয়ে থাকে তার জন্য তাকে যে দাম দিতে হয়, সাধারণ অর্থে তাই হলো সুদ (interest)। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ঋণের জন্য ঋণদাতাকে যে দাম দেয় তাকে সুদ বলে। যেমন কোনো ব্যক্তি ১০০০ টাকা ধার নিয়ে এক বছর পরে ১২০০ টাকা ফেরৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। সুতরাং এক্ষেত্রে বাৎসরিক সুদের হার হবে শতকরা ২০ টাকা। ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের পর ঋণদাতাকে আসল অর্থ ছাড়াও যে অতিরিক্ত অর্থ দেয় তাই হলো সুদ।

তবে অর্থনীতির পরিভাষায় সুদ হলো অর্থ বা সম্পদ ধার নেয়ার জন্য প্রদান করা 'ভাড়া'। ঋণদাতা ঋণপ্রদানের জন্য এই সুদ ধার্য করে থাকে। মূলত যে পরিমাণ অর্থ ধার দেয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় মূল, এবং এই মূল এর যত অংশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদ হিসেবে প্রদান করতে হয়, তাকে সুদের হার বলে।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। যেমন –

১. অধ্যাপক Senior এর মতে, 'সুদ হলো বর্তমান ভোগ বিরতির পুরস্কার।'

২. অধ্যাপক Marshall এর মতে, 'সুদ হলো ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য প্রতীক্ষার পুরষ্কার।'

৩. Robertson বলেন, 'ঋণযোগ্য তহবিল ব্যবহারের দাম হলো সুদ।'

৪. Keynes এর মতে, 'কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ টাকা পরিত্যাগ করার জন্য যে পুরস্কার পাওয়া যায়, তা হলো সুদ।'

অতএব বলা যায়, পুঁজি ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতা পুঁজির মালিককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে যে অর্থ প্রদান করে তাই হলো সুদ। পুঁজির উৎপাদনশীলতা আছে বলেই পুঁজির মালিক সুদ লাভ করে।

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদকে (ربا) 'রিবা' বলা হয়। এই শব্দের মূল ধাতু হল (و ب ر) যার আভিধানিক অর্থ হল, বাড়, বৃদ্ধি, আধিক্য, স্ফীতি প্রভৃতি। ربَا অর্থাৎ বেড়েছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে। ربا السويق অর্থাৎ ছাতু ঘোলার পর ফেঁপে উঠেছে। ربا في حجره অর্থাৎ সে তার কোলে প্রতিপালিত (বড়) হয়েছে। أربى الشيء সে জিনিসটাকে বাড়িয়েছে ইত্যাদি অর্থ অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে এই বৃদ্ধি করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ٢٧٦

আল্লাহ সূদকে বিলুপ্ত করেন এবং খয়রাতকে বৃদ্ধি করেন, আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপীদেরকে ভালবাসেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি সুদকে সমূলে ধ্বংস করেন। অর্থাৎ হয় ওটাকেই সরাসরি নষ্ট করেন, না হয় ওর বরকত নষ্ট করে থাকেন। দুনিয়াতেও ওটা ধ্বংসের কারণ হয় এবং পরকালেও শাস্তির কারণ হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ (আরবি) অর্থাৎ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয় যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্ময়াভিভূত করে।" (৫:১০০) অন্য স্থানে রয়েছেঃ (আরবি) অর্থাৎ তিনি মলিনতাপূর্ণ জিনিসকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে নরকে নিক্ষেপ করবেন।' (৮:৩৭) অন্যত্র রয়েছেঃ তোমাদেরকে প্রদত্ত সুদ দ্বারা তোমরা যে তোমাদের মালকে বৃদ্ধি করতে চাচ্ছ তা আল্লাহর নিকট বাড়ে না। এই জন্যেই হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, সুদ বেশী হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কমেই যায়। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

___সূরা বাকারাহ:২৭৬

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ ١٣٠

হে মু'মিনগণ! তোমরা সুদ খেও না ক্রমবর্ধিতভাবে, আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদের সুদ আদান প্রদান হতে এবং ভক্ষণ হতে নিষেধ করেছেন। অজ্ঞতা যুগের লোকেরা সুদের উপর ঋণ প্রদান করতো। ঋণ পরিশোধের একটি সময় নির্ধারিত হতো। ঐ সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদের উপর সুদ বৃদ্ধি করা। হতো। এভাবে চক্রাকারে সুদ বৃদ্ধি পেতে পেতে মূলধন কয়েক গুণ হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে এরূপ অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ধ্বংস করতে চরমভাবে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করতঃ ওর উপর মুক্তিদানের অঙ্গীকার করছেন।

___*সূরা আল ইমরান :১৩০*

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় সুদের ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে তা শুধুই চর্মচক্ষুতে দৃশ্যমান। বরং সুদের ফলে একজন মানুষ, গোটা জাতি ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। এজন্যই আল্লাহ কুরআনে সুদের ব্যপারে মুমিনদের অনুৎসাহিত করেছেন এবং যাকাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

◆ সুদ কত প্রকার ও কি কি?

সুদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

ক. মোট সুদ (gross interest); এবং

খ. নীট সুদ (net interest)। নিচে এদের বর্ণনা প্রদান করা হলোঃ

ক) মোট সুদ (gross interest): ঋণদাতা আসলের (অতিরিক্ত যে অর্থ পায়, তাকে মোট সুদ। এই মোট সুদের মধ্যে শুধু ঋণ-মূলধন ব্যবহারের জন্য দেয়া অর্থ ছাড়াও আরও কতগুলো বিষয়যুক্ত হয়ে পড়ে। মোট সুদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য বিষয়গুলো হলো ঝুঁকি গ্রহণের জন্য অর্থ, ঋণের হিসাব রাখার খরচ, ঋণ প্রদান ও গ্রহণ ব্যবস্থাপনার খরচ এবং ঋণ-মূলধন ব্যবহারের জন্য অর্থ ইত্যাদি। সুতরাং ঋণ গ্রহীতা মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার, ঋণ ব্যবস্থাপনা আদায় ও অন্যান্য অসুবিধা এবং

ঝুঁকি বহনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে ঋণদাতাকে আসলের অতিরিক্ত মোট যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাকে মোট সুদ বলে।

(খ) নীট সুদ (net interest): শুধু মূলধনের উৎপাদনশীলতা ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সময়াস্তে মূলধনের মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে নীট সুদ বলে। অর্থাৎ মোট সুদ থেকে ঋণ ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক, ঋণ আদায়ের খরচ এবং ঋণের ঝুঁকি বহনের মূল্য, প্রভৃতি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নীট সুদ বলে। অর্থনীতিতে সুদ বলতে মূলত নীট সুদকেই বোঝানো হয়। ধরা যাক, কোন ঋণদাতা ১০০০ টাকা ধার দিয়ে এক বছর পর ঋণগ্রহীতার নিকট হতে ঋণের সুদ বাবদ ১০০ টাকা লাভ করল। এই ১০০ টাকা হলো মোট সুদ। এই ১০০ টাকা সুদের মধ্যে মূলধন ব্যবহারের জন্য ৫০ টাকা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় অর্থাৎ ঝুঁকি বহনের জন্য ২৫ টাকা, ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য ১৫ টাকা এবং ঋণ আদায়ের অন্যান্য অসুবিধার জন্য ১০ টাকা পাওয়া গেলো। সুতরাং, নীট সুদ = মোট সুদ – আনুষঙ্গিক ব্যয় =১০০ (২৫ + ১৫ + ১০) = ৫০ টাকা।

(তথ্যসুত্র-ইন্টারনেট)

◆ যাকাত কি?

যাকাত (الزكاة) (: زكاة *zakāt*, "যা পরিশুদ্ধ করে", আরও زكاة ألمال, "সম্পদের যাকাত") হলো ইসলাম ধর্মের পঞ্চস্তম্ভের একটি। প্রত্যেক স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলমান নর-নারীকে প্রতি বছর স্বীয় আয় ও সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ, যদি তা ইসলামী শরিয়ত নির্ধারিত সীমা (নিসাব পরিমাণ) অতিক্রম করে তবে, গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের নিয়মকে যাকাত বলা হয়। সাধারণত নির্ধারিত সীমার অধিক সম্পত্তি হিজরি ১ বছর ধরে থাকলে মোট সম্পত্তির ২.৫ শতাংশ (২.৫%) বা ১/৪০ অংশ বিতরণ করতে হয়। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে হজ্জ্ব এবং যাকাত শুধুমাত্র শর্তসাপেক্ষ যে, তা সম্পদশালীদের জন্য ফরয বা আবশ্যিক হয়। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনে "যাকাত"

শব্দের উল্লেখ এসেছে ৩২ বার। নামাজের পরে সবচেয়ে বেশি বার এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলে,

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِكُمۡ مِّنۡ خَيۡرٍ تَجِدُوۡهُ عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ

এবং তোমরা নামায কায়িম কর এবং যাকাত দাও এবং যা কিছু সৎ কার্যাবলী তোমরা স্বীয় আত্মার জন্যে আগে পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট পাবে, তোমরা যা কিছু করছো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা' দেখছেন।

___সূরা বাকারাহ:১১০

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা পবিত্র কুরআনে সুদকে বর্জন যাকাতকে গ্রহণ করতে বলেছেন। সুদ একটা জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে আর যাকাত বন্ধুত্ব। সুদ ধনীকে শোষকে পরিণত করে আর যাকাত ধনীকে গরীবের হকের প্রতি সচেতন করে এবং গরিবকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। বরং যাদের উপর যাকাত ফরজ তারা তার হকদারকে যাকাত প্রদান না করলে আল্লাহ তা'আলা শাস্তির কথা বলেছেন।

৭.২: রাষ্ট্রসমাজে সুদ ও যাকাতের প্রভাব

০ সুদ ০

সুদ মানবতার জন্য অভিশা, এর ফলে মানবতার ধ্বংস হয়। সুদের প্রভাবে বিদায় নেয় মুমিনের পারস্পরিক সহানুভূত, জন্ম নেয় সীমাহীন অর্থলিপ্সা ও স্বার্থপরতা। অতিরিক্ত লোভ লালসার কারণে সুদি কারবারিরা তখন মানুষের জান মাল ও ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে থাক। সুদি কারবারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ জনগণ। সুদের কারণে শোষিত হচ্ছে সমাজ। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক। সুদী সমাজের লোকেদের সুখ ভোগই হয়ে পড়ে জীবনের প্রধান কর্ম। অবৈধভাবে জনগণের ধন লুটে নেওয়ার প্রবণতা প্রবলভাবে দেখা দেয়। টাকাই তাদের কাছে

সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়। ফলে তাদের হৃদয়ে দরিদ্রদের প্রতি দয়া মায়া স্থান পায় না। মানুষের এরকম অভাবের মুহূর্তকে তারা নিজেদের সবচেয়ে বড় সুযোগ বলে মনে করে। দরিদ্রদের নিজের অর্থ উপার্জনের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তাই তো সুদের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দেয় তাদের বেঁচে থাকার সামান্য অংশটুকু। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান যুগে সুদ মহামারী আকার ধারণ করেছে সমগ্র বিশ্ব আজ এর রাহুগ্রাসে পতিত।

○ যাকাত ○

হতাশা ও চিন্তামুক্ত সমাজ গঠন। ধনী- দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ। ধনীদের সম্পদ গরীবের অধিকার প্রতিষ্ঠা। অভাব, দূর্দশা, ক্ষুদা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন। সম্পদকে পবিত্র করে সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপন। মজুতদারি বন্ধ করে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি। ঋণগ্রস্থদের ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা। সর্বোপরি বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজ গঠন হয়। *(তথ্যসূত্র:ইন্টারনেট)*

পাঠ্যপুস্তকগুলোতে উচিত ছিল যাকাতের অংক শেখানো....! কিন্তু শেখানো হয়েছে সুদের অংক। তাই আমরা সুদের হিসাব বুঝি কিন্তু...! যাকাতের হিসাব বুঝিনা।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে ,রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক নয় বরং কুরআনের ভূমিকা বেশি।

৭.৩: বিবর্তনবাদ বনাম ভ্রুণতত্ত্ব

وَاِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلٰٓٮِٕكَةِ اِنِّىۡ جَاعِلٌ فِى الۡاَرۡضِ خَلِيۡفَةً ؕ قَالُوۡٓا اَتَجۡعَلُ فِيۡهَا مَنۡ يُّفۡسِدُ فِيۡهَا وَيَسۡفِكُ
الدِّمَآءَۚ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَـكَؕ قَالَ اِنِّىۡٓ اَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ٣٠

স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি’; তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি’। তিনি বললেন, ‘আমি যা জানি, তোমরা তা জান না’।

_সূরা বাকারা:৩০

পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বিজ্ঞানের নামে ধোকা দেওয়া হচ্ছ। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেখানে সৃষ্টির সেরা জীব বলেছেন পাঠ্যপুস্তগুলো সেখানে আমাদেরকে শিখায় ভিন্ন কিছ, সামান্য নিকৃষ্ট এক বানর থেকে মানুষের সৃষ্ট। কোন জাতি যদি নিজের সৃষ্টি রহস্য এভাবে জানে এবং বিশ্বাস করে সামান্য নিকৃষ্ট বানর হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষ তাহলে সে জাতি কি করে রাষ্ট্র সমাজ পরিবর্তনে ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে? রাষ্ট্র সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকায় বেশি।

তা আমরা ডারউইনের বিবর্তনবাদ তথ্য এবং আল্লাহ সুবহানাতায়ালা কুরআনে এ সম্পর্কে কি বলেছেন সেটা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বিবর্তনবাদ : আধুনিক বিজ্ঞানের যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তার অন্যতম ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব।

তার এই তত্ত্বে দেখানো হয়েছে প্রাণীরা সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

বিবর্তনবাদের এই তত্ত্বটি আমাদের পৃথিবীর পশুপাখি ও উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে বুঝতে বড়ো ধরনের ভূমিকা রেখেছে।

তার এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে বলা হয় ন্যাচারাল সিলেকশন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন যার মাধ্যমে একটি প্রাণীর জনগোষ্ঠী থেকে নতুন প্রজাতির উদয় ঘটে।

এই থিওরি বিজ্ঞানের জগতে বৈপ্লবিক তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

অন দ্য অরিজিন অফ স্পেশিস নামে চার্লস ডারউইনের এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। তার এই গ্রন্থে তিনি বিবর্তনবাদকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে কোনো প্রাণী ক্রমাগত অভিযোজনের ফলে আপন পরিবেশের জন্যে বিশেষায়িত হতে হতে এক সময় নতুন একটি প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়।

ডারউইন বলেন,**'মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি'**

ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়ের ১১৫ নাম্বার পেইজে বানর থেকে মানুষ এসেছে বলা হয়েছে– যদিও মানুষ বিবর্তনের ফসল হিসেবে ধাপে ধাপে বর্তমানের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

ভ্রুণতত্ত্ব: আল-কুরআনের প্রথম শব্দ 'ইক্করা' কুরআনের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে-

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ

خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি (সব কিছু) সৃষ্টি করেছেন।তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা—আল আলাক - ১-২

এই বাক্যের মধ্যে অনতত্ত্বের সকল রহস্য লুকায়িত রয়েছে যা এতদিন পর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে।

কিভাবে লুকায়িত রয়েছে ?

এই বাক্যের আরবিতে 'আলাক' শব্দ রয়েছে। আরবি ভাষায় আলাক শব্দের অর্থ হলো জন্মাট রক্ত এবং এর অপর অর্থ হল দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে এমন আঠালো জিনিস। যেমন: 'জোঁক – যেটি কামড় দিয়ে আটকে থাকে।

কুরআনে একথাটি ১৪০০ বছর আগে বলে দেয়া হয়েছে যে- এটি দেখতে জোঁকের মতো " - এটি বিজ্ঞানীরা অনেক পরে আবিষ্কার করেন।

ড.মুর নামে এক বিজ্ঞানী এই বাক্যটি analysis করে দেখলেন মানুষের জুনীর অবসথা সত্যিকার জোঁকের মতো।

এখানে ঈসা (আঃ) এর জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এ প্রশ্নের জবাবও যথাযথভাবে কোরআনে দিয়ে রেখেছেন- তিনি বলেন-

اِنَّ مَثَلَ عِیۡسٰی عِنۡدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنۡ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ کُنۡ فَیَکُوۡنُ *নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।আলে ইমরান - ৫৯*

"ভ্রূনের পর্যারসমূহ

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে এভাবে সৃষ্টি করেন যে, তিন অন্ধকারের মধ্যে তোমরা একের পর এক সৃজন স্তর অতিক্রম কর।

—আয্‌-যুমার - ৬

অধ্যাপক কেইথ মুরের মতে, কোরআনে উল্লেখিত অন্ধাকারের তিনটি পর্দা বলতে বোঝায়

১. মাতৃগর্ভের সম্মুখ দেয়াল

২. জরায়ুর দেয়াল

৩. জরায়ুতে ভ্রূণকে আবৃতকারী গর্ভফুলের অভ্যন্তরীণী অতি পাতলা পর্দা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ١٢
ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ١٣
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ
خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۗ ١٤

আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট বাঁধা রক্তে, অতঃপর মাংসপিন্ডকে পরিণত করি হাড্ডিতে, অতঃপর হাড্ডিকে আবৃত করি মাংস দিয়ে, অতঃপর তাকে এক নতুন সৃষ্টিতে উন্নীত করি। কাজেই সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান!

___ সূরা মুমিন : ১২-১৪

"মানুষের ভ্রূণ বিকাশের স্তরগুলো"

নিচের উল্লেখিত আয়াতেও মানুষের ভ্রুন বিকাশের স্তরগুলো উল্লেখ করা হয়েছে -

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اَلَمۡ یَکُ نُطۡفَۃً مِّنۡ مَّنِیٍّ یُّمۡنٰی ۳۷

ثُمَّ کَانَ عَلَقَۃً فَخَلَقَ فَسَوّٰی ۳۸

فَجَعَلَ مِنۡہُ الزَّوۡجَیۡنِ الذَّکَرَ وَالۡاُنۡثٰی ۳۹

সে কি (মায়ের গর্ভে) নিক্ষিপ্ত শুক্রবিন্দু ছিল না? তারপর সে হল রক্তপিন্ড, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন ও সুবিন্যস্ত করলেন। অতঃপর তা থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন জুড়ি- পুরুষ ও নারী।

___ সূরা কিয়ামাহ:৩৭-৩৯

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন__

الَّذِیۡ خَلَقَکَ فَسَوّٰىکَ فَعَدَلَکَ ۷

فِیۡۤ اَیِّ صُوۡرَۃٍ مَّا شَآءَ رَکَّبَکَ ۸

যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তোমাকে করেছেন ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছেমত আকৃতিতে গঠন করেছেন।

___সূরা ইনফিতার:৭-৮

'কারাবিন' একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ জরায়ু। জরায়ু সর্বদা পেছনের দিক মেরুদন্ড দ্বারা আবৃত থাকে। মেরুদণ্ড আবার মাংসপেশি দ্বারা সমর্থিত। ভ্রূণের গর্ভফুলের রস গুলো সংরক্ষিত । এগুলো দ্বারা বুঝা যায়, ভ্রুণ একটা সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করছে।

আমরা জানি,

স্বল্প পরিমাণ তরল পদার্থ আলাক - এটি মাংস পেশিতে পরিণত হয়। আর একটি অর্থ আটকে থাকে। এটি দেখতে জোঁকের মতো। মূলত এই আলাকের শুক্রগুলো আমাদের গর্ভফুলের মাধ্যমে রক্ত সরবারহের মাধ্যমে ভিতরে ঢুকে । তৃতীয় অর্থ হলো

রক্তপিন্ড | গর্তে রক্তপিণ্ড স্তরে থাকা অবস্থায় গর্ভে ৩য় ও ৪র্থ সপ্তাহে এই রক্তপিণ্ডের বদ্ধ খনিতে অবস্থান করে। অর্থাৎ ভ্রূণ স্থাপন করা হলো। ফলে ভ্রূণ রক্তপিণ্ডের আকার ধারণ করলো এবং একসময় জোকের আকার ধারণ করলো।

এগুলো সবই আল কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বকে ভুল ও অযৌক্তিক বলার পরও আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের এই তত্ত্ব পড়ানো হয়। আর এই পাঠ্যপুস্তক কি করে রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখতে পারে?

১৬৭৭ সালে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী Antonie van এর microscope দ্বারা শুক্রকোষ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। Leeuwenhoek এর microscope দ্বারা শুক্রকোষ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, শুক্রকোষ ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষ হিসেবে বিবেচ্য এবং শিশু জন্মের সময় এটা জরায়ুতে বিকাশ লাভ করে।

পরবর্তীতে আরেকজন বিজ্ঞানী Regrier De great 25 দেখলেন যে, ডিমের মধ্যে ভ্রূণ ক্ষুদ্রাকৃতির অবস্থান করে |

"আবার ১৮০০ শতাব্দীতে এসে আরেকজন বিজ্ঞানী Twist একটি তত্ত্ব দিলেন যেটি ·Marpe Theory of biparental হিসেবে পরিচিত। দৈত্য উত্তরাধিকারী তত্ত্ব। সেটিতে বললেন, যে, আলাক পরে মুগদায় পরিণত হয়। মুগদা হলো যা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ফেলা প্রায় এবং যা আঠালো ও ছোট যা মুখে দেয়া যায়। অর্থাৎ চুইংগামের মতো। এ দুটি ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ ।

অধ্যাপক কেইথমুর তারপর এই ভ্রুণের প্রাথমিক পর্যায়গুলো বানিয়ে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে মুগদায় পরিণত করার চেষ্টা করেন এবং সেটা তার পর্যবেক্ষণ - এর সাথে মিলে যায়। এই মুগদা পরবর্তীতে **ইযাম্বা** হাড়ে পরিণত হয়।

তারপর কুরআনের এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করলেন যে মহানবী (সঃ) এর কাছে ঐ সময়ে ত কোনো microscope ছিলো না। ১৪০০ বছর আগে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং mieronapor আবিষ্কার হয়েছে আরো বহু শতাব্দী পরে। সুতরাং কুরআনের বানী স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ' এবং তা সত্য।

রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা যদি কুরআনকে গুরুত্ব দেই তাহলে আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাবো।

৭.৪: ইলেক্ট্রিক লাইট

বাতির আবিষ্কার সম্পর্কে সূরা নূর ও বলা হয়েছে-

اَللّٰهُ نُوۡرُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ مَثَلُ نُوۡرِهٖ كَمِشۡكٰوةٍ فِيۡهَا مِصۡبَاحٌ ؕ اَلۡمِصۡبَاحُ فِىۡ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوۡكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوۡقَدُ مِنۡ شَجَرَةٍ مُّبٰـرَكَةٍ زَيۡتُوۡنَةٍ لَّا شَرۡقِيَّةٍ وَّلَا غَرۡبِيَّةٍ ۙ يَّـكَادُ زَيۡتُهَا يُضِىۡٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٌ ؕ نُوۡرٌ عَلٰى نُوۡرٍ ؕ يَهۡدِى اللّٰهُ لِنُوۡرِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَ يَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ لِلنَّاسِؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ۙ ٣٥

আল্লাহ আসমান ও যমীনের আলো, তাঁর আলোর দৃষ্টান্ত হল যেন একটি তাক- যার ভিতরে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি হচ্ছে কাঁচের ভিতরে, কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা প্রজ্জ্বলিত করা হয় বরকতময় যায়তুন গাছের তেল দ্বারা যা পূর্বদেশীয়ও নয়, আর পশ্চিমদেশীয়ও নয়। আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও তার তেল যেন উজ্জ্বলের বেশ নিকটবর্তী, আলোর উপরে আলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন স্বীয় আলোর দিকে পথ দেখান। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

[সূরা নূর: ৩৫]

১৮০২ সালে প্রায় দুইশত বছর আগে হামফ্রে ডেভি নামে একজন বিজ্ঞানী প্রথম আর্ট ল্যাম্প আবিষ্কার করে যা ৭৫ ঘন্টার বেশি জ্বলতে পারতো না। বেশি উত্তাপ হতো।

আধুনিক বিজ্ঞানে ইলেক্ট্রিক লাইটের ধারণা দিয়েছে টমাস আলভা এডিসন ১৮৭৯ সালে।

ইলেক্ট্রনের লাফালাফিতে আলোর উৎপন্ন হয়। প্রজ্বলনের সময় আলোর মতো ছড়িয়ে যায় না।

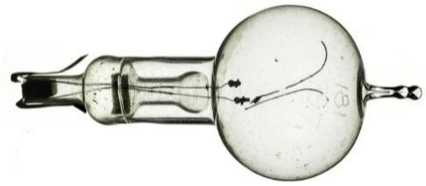

আধুনিক যানবাহন সম্পর্কে সূরা ইয়াসীনের ৪২ নং আয়াতে ধারণা দেয়া হয়েছে।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ٤٢

"এবং তাদের জন্য নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে থাকে।"'

[সূরা ইয়াসিন: ৪২]

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨

তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গর্দভ সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা ওগুলোতে আরোহণ করতে পার আর শোভা-সৌন্দর্যের জন্যও; তিনি পয়দা করেন অনেক কিছু যা তোমাদের জানা নেই।[সূরা নাহল: ৮]

→ অরভিল এবং উইলবার ১৯০৩ আলে প্রথম উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেন। অথচ মহান আল্লাহ ১৪০০ বছর পূর্বেই এসব জিনিসের ইঙ্গিত 'দিয়েছেন।

৭.৫: সমস্ত জীবিত জিনিস জোড়ায় সৃষ্টি হয়

বিজ্ঞানীরা পূর্বে ধারণা করছেন উদ্ভিদের মধ্যে পুংলিঙ ও স্ত্রীলিঙ্গ নেই। 1879 সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন শুধু জীবজন্তুর মধ্যে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ নেই, উদ্ভিদের মাধ্যও আছে।

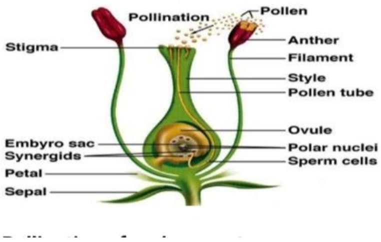

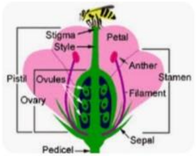

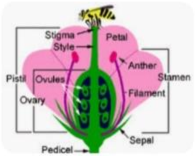

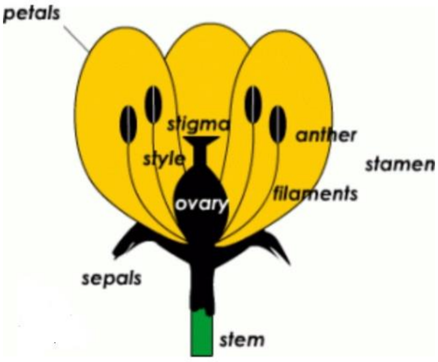

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ১৪০০ বছর পূর্বেই বলেছেন,

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦

পূত পবিত্র সেই সত্তা যিনি জোড়া সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটির যা উৎপন্ন করে যমীন, আর তাদের নিজেদের ভিতরেও আর সে সবেও যা তারা জানে না।

—সূরা ইয়াসিন:৩৬

'তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোরা। [সুরা রাদ: ৩]

★অধ্যায় ৮:সমকামিতা(ল্যাটেস্ট নেইম ট্রান্সজেন্ডার)

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত সমালোচিত বিষয় সেটা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার। একজন পুরুষ বা নারী নিজেকে মনে মনে যাই ভাবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা তাকে তাই বলে স্বীকৃতি দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। জন্মগতভাবেই মানুষের লিঙ্গ থাকে। আর তার ভিত্তিতেই সমাজ নারী ও পুরুষ নির্ধারণ করে। আর যাদের নারী পুরুষের লিঙ্গ নেই তাদেরকে সমাজ তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজরা বলে সম্বোধন করে। কিন্তু বর্তমানে একদল মানুষ নিজেদেরকে পুরুষ থেকে নারী হওয়ার দাবি করে এবং সমকামী মনোভাব

পোষণ করে।আল্লাহ সুবহানুতায়ালা কুরআনে এইসব সমকামীদের কে লানত করেছেন। নিম্নে এ অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

৮.১: জেন্ডার

জেন্ডার বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান এবং সময়োপযোগী অতীব গুরুত্বপূর্ণ তর ধারণা। জেন্ডার বিভিন্ন সমাজে নারী ও পুরুষের অসম অবস্থান, সমাজকাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে এবং নারীকে সমঅধিকারের ভিত্তিতে পুরুষের সাথে উন্নয়নে অংশগ্রহণে পথ প্রশস্ত করে। এজন্যই সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের কৌশল নির্ধারণে জেন্ডার খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

জেন্ডার (Gender) হচ্ছে নারী-পুরুষের সমাজ বিনির্মিত পার্থক্য। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর Sex (পুরুষ ও নারীর জৈবিক পার্থক্য) ভেদাভেদকে ভিত্তি হিসেবে ধরে সমাজ নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। সমাজ কর্তৃক সং বিনির্মিত নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ককে জেন্ডার নামে চিহ্নিত করা হয়।

"অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি', æজেন্ডারকে বৈশিষ্ট্য, ভূমিকা এবং দায়িত্বের সেট হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা নারীদের পুরুষদের থেকে আলাদা করে (কাজের ধরণ এবং আচরণ) যা জৈবিকভাবে তৈরি নয়, তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।"

Joan W. Scot বলেন, æGender is the social organization of the relationship between sexs." অর্থ্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্কের সামাজিক সংগঠন হচ্ছে জেন্ডার।

৮.২: লিঙ্গ

নারী অধ্যয়ন ও গবেষণায় জেন্ডার প্রত্যয়টি সাম্প্রতিককালে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উন্নয়ন ও রাজনীতির মূলস্রোতে জেন্ডার ভূমিকা ও সংবেদনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ। জেন্ডার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও অবস্থানের চিত্র তুলে ধরে। অপরদিকে শারীরবৃত্তীয় কাঠামোয় নারী ও পুরুষের অপরিবর্তনীয় জৈব চিহ্নের উপর ভিত্তি করে সেক্স প্রত্যয়টি ব্যাখ্যাত হয়। সেক্স প্রকরণ

দুটি, নারী ও পুরুষ। সেক্স বা লিঙ্গ: জৈবিক চিহ্নের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করার জন্য সেক্স প্রত্যয়টি ব্যবহার

করা হয়ে থাকে। সেক্স মানুষের অপরিবর্তনীয় এক জৈবিক বৈশিষ্ট্য। জন্মগতভাবেই কোনো মানুষ পুরুষ অঙ্গের অধিকারী আবার কোনো মানুষ স্ত্রী অঙ্গের অধিকারী। এরূপ ভিন্ন দেহাঙ্গের কারণে একজনকে পুরুষ আর একজনকে নারী বলা হয়। শারীরবৃত্তীয় দিক থেকে নারী ও পুরুষ ভিন্ন- এটিই সেক্স প্রত্যয়টির মূলকথা। কিন্তু এই শরীর বৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের সামাজিক সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের দিকটি হচ্ছে জেন্ডার। এ প্রত্যয়টি দ্বারা নারী ও পুরুষকে দুটি আলাদা সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ভূমিকাতে আলাদা করে দেওয়া হয়। যার কারণে আজ থেকে মাত্র এক শতাব্দী পূর্বেও নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখা হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও ভূমিকায় অনেকখানি সমতা এসেছে এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে নারী ও পুরুষ উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে সমান ভূমিকা রাখতে পারে।

বলা যায় যে, জৈবিক পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সেক্স বা লিঙ্গ প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। এই পার্থক্যের কারণেই মানব জাতির দুটি অংশের একটি নারী, অপরটি পুরুষ। জৈবিক কারণে কেউ পুরুষ হয়ে জন্মায়, কেউ নারী হয়ে জন্মায়।

৮.৩: ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ (Transgenderism) বা রূপান্তরকামীতা।

এই মতবাদ বলে, কোন পুরুষের যদি নিজেকে নারী বলে মনে হয়, তাহলে সে একজন নারী। সমাজ ও আইন নারী হিসেবেই তাকে বিবেচনা করবে। সেই পুরুষ শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হোক, তিন বাচ্চার বাপ হোক, কিছু আসে যায় না তাতে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলে, কোন নারীর নিজেকে যদি পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ। যদিও তার মাসিক হয়, সে গর্ভবতী হয়, শারীরিকভাবে সে হয় ১০০% সুস্থ। নিজেকে পুরুষ মনে করা নারী যদি সন্তানের জন্ম দেয় তাহলে সেটা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ভ্রান্তির প্রমাণ না। বরং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের চোখে এটাই প্রমাণ করে যে, পুরুষও সন্তান জন্ম দিতে পারে।

এই মতবাদ অনুযায়ী, কোনো বালকের যদি মনে হয় সে বালিকা অথবা কোনো বালিকার যদি মনে হয় সে বালক, তাহলে এই মনে হওয়ার ভিত্তিতে সেই বালক কিংবা বালিকাকে চাহিবামাত্র হরমোন ট্রিটমেন্ট আর বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে নিজের শরীরকে বদলে ফেলার অধিকার দিতে হবে। তার এই মনে হওয়ার চিকিৎসা করা যাবে না, বরং বদলে দিতে হবে শরীরকে।

এই ট্রান্সদের সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরা হল

হি-জ-ড়া এবং ট্রা-ন্স-জে-ন্ডা-র এর মৌলিক পার্থক্য

হি-জ-ড়া	ট্রা-ন্স-জে-ন্ডার
• এটি জন্মগত সমস্যা। ল্যাব টেস্ট (জেনেটিক ও বায়োকেমিকেল) করে এটি প্রমাণ করা যায়। • এটা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। প্রতি ৫০০০ শিশুর একজন হি-জ-ড়া হতে পারে। • একটি শিশু **অস্পষ্ট** বাহ্যিক প্রজনন অংগ নিয়ে জন্মাতে পারে। কারোর ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি, এমনকি ২০-২৫ বছর বয়সেও শারীরিক পরিবর্তন হতে পারে। • অবিকল মেয়ে হিসেবে বড় হতে থাকে কিন্তু তখনই বুঝা যায় সে আসলে পুরুষ যখন বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাসিক বা রক্তস্রাব শুরু হচ্ছে না। • এরা সন্তান জন্ম দিতে পারে না।	• এটা মানসিক অবস্থা যার সাথে জন্মগত লিংগের কোন সম্পর্ক নেই। একজন ছেলে বা মেয়ে নিজেকে 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে' বলে মনে করে। • **এটা ল্যাব টেস্ট করে প্রমাণ করা যায় না।** স্ব-ঘোষিত ব্যাপার (self-identified) • হরমোন বা সার্জারি করে ট্রা-ন্সজে-ন্ডার হলো কিনা তা মুখ্য নয়। এই আইডেন্টিটি যেভাবে প্রকাশিত হতে পারে: নাম পরিবর্তন (যেমন পুরুষ থেকে নারীর নাম), নতুন সম্বোধন (pronouns)- He থেকে She, অথবা They; পোষাক পরিবর্তন, মেকাপ পরিবর্তন (যেমন-নেইল পলিশ, চুল মেয়েদের মত করে রাখা) • সার্জারী করে জরায়ু বানানো যায় না, আবার কার্যকরি পেনিসও তৈরী করা যায় না যা দিয়ে বীর্যপাত হয়। • গবেষণায় অনুসারে ২০% ট্রা-ন্সজে-ন্ডার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করে বাহ্যিক নারী বা পুরুষের মত কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও বাস্তবে **৯৮% এর ট্রা-ন্স নারীর পেনিস থাকে, তেমনিভাবে ট্রা-ন্স পুরুষের যৌনী থাকে।** • ট্রা-ন্সজে-ন্ডাররা মূলত **সমকামী**, আবার বাই-সেক্সুয়ালও হতে পারে

হি-জ-ড়া এবং ট্রা-ন্স-জে-ন্ডা-র এর মৌলিক পার্থক্য

হি-জ-ড়া	ট্রা-ন্স-জে-ন্ডার
• এটি জন্মগত সমস্যা। ল্যাব টেস্ট (জেনেটিক ও বায়োকেমিকেল) করে এটি প্রমাণ করা যায়। • এটা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। প্রতি ৫০০০ শিশুর একজন হি-জ-ড়া হতে পারে। • একটি শিশু **অস্পষ্ট** বাহ্যিক প্রজনন অংগ নিয়ে জন্মাতে পারে। কারোর ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি, এমনকি ২০-২৫ বছর বয়সেও শারীরিক পরিবর্তন হতে পারে। • অবিকল মেয়ে হিসেবে বড় হতে থাকে কিন্তু তখনই বুঝা যায় সে আসলে পুরুষ যখন বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাসিক বা রক্তস্রাব শুরু হচ্ছে না। • এরা সন্তান জন্ম দিতে পারে না।	• এটা মানসিক অবস্থা যার সাথে জন্মগত লিংগের কোন সম্পর্ক নেই। একজন ছেলে বা মেয়ে নিজেকে 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে' বলে মনে করে। • **এটা ল্যাব টেস্ট করে প্রমাণ করা যায় না।** স্ব-ঘোষিত ব্যাপার (self-identified) • হরমোন বা সার্জারি করে ট্রা-ন্সজে-ন্ডার হলো কিনা তা মুখ্য নয়। এই আইডেন্টিটি যেভাবে প্রকাশিত হতে পারে: নাম পরিবর্তন (যেমন পুরুষ থেকে নারীর নাম), নতুন সম্বোধন (pronouns)- He থেকে She, অথবা They; পোষাক পরিবর্তন, মেকাপ পরিবর্তন (যেমন-নেইল পলিশ, চুল মেয়েদের মত করে রাখা) • সার্জারী করে জরায়ু বানানো যায় না, আবার কার্যকরি পেনিসও তৈরী করা যায় না যা দিয়ে বীর্যপাত হয়। • গবেষণায় অনুসারে ২০% ট্রা-ন্সজে-ন্ডার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করে বাহ্যিক নারী বা পুরুষের মত কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও বাস্তবে **৯৮% এর ট্রা-ন্স নারীর পেনিস থাকে, তেমনিভাবে ট্রা-ন্স পুরুষের যৌনী থাকে।** • ট্রা-ন্সজে-ন্ডাররা মূলত **সমকামী**, আবার বাই-সেক্সুয়ালও হতে পারে

বর্তমান বিশ্বে মাদকের চেয়েও ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ছে এই ট্রান্সজেন্ডার বাদ। তাদের এই কর্মকাণ্ড থেকে মনে হয় শিয়াল এসে মুরগিকে বললো আমি মনে মনে মুসগি আমাকে তোমাদের সাথে থাকতে দাও এবং এরপর যা হওয়ার তা হয়ে গেলো। বর্তমান পাঠ্যপুস্তগুলো সুন্দর করে তা প্রমোট করছে।

সপ্তম শ্রেনীর বইতে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতার নামে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানী করা ভয়ঙ্কর এলজিবিটি এজেন্ডার (LGBT Agenda) বিষ প্রবেশ করানো হয়েছে। সহজ ভাষায় এলজিবিটি এজেন্ডার উদ্দেশ্য অধিকারের নামে অসুস্থতা এবং নানাধরণের যৌন বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ে ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামের লেখায় ৫১ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফা বলছে,

আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও "আমি মনে মনে একজন মেয়ে....

৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে,

"আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্রান্সজেন্ডার"।

৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, যতক্ষণ না অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে ততক্ষণ যা খুশি তাই করা যায়। একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি কোনো এক বয়সে নিজেকে নারী দাবী করে তাহলে সে নারী। আবার নারী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবী করে তাহলে সে পুরুষ। এমন আচরণ সমাজের জন্য কোনো ক্ষতিকর নয় এমন দাবী করে যারা এটা মেনে নেবে না তাদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছে সেখানে।

এই কথাগুলোর মাধ্যমে 'ট্রান্সজেন্ডার' (transgender) নামক মানসিক অসুস্থতা ও বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বইতে হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডারকে একই (সমার্থক) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে

হিজড়াদের প্রতি থাকা সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্য।

বাস্তবতা হলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ সত্যিকার অর্থেই এতোটা বিদঘুটে, বিচিত্র, বিকৃত। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সাথে শারীরিক ত্রুটি বা এ জাতীয় কোনো কিছুর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ, শারীরিকভাবে ১০০% নারী বা পুরুষ, যারা একসময় স্বাভাবিকভাবে বাবা কিংবা মা হয়েছে-এক পর্যায়ে এসে নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের বলে ঘোষণা দিচ্ছে, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরতে শুরু করছে, নাম বদলাচ্ছে।

ইসলামের অবস্থান:

মুসলিম হিসেবে আমাদের মাপকাঠি ইসলাম। পবিত্র কুরআনের আরেকটি নাম হল আল-ফুরকান যার অর্থ হল সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী। আমাদেরকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন **আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)**। দৈনন্দিন জীবনের নিয়ম কানুন থেকে শুরু করে বিশ্ব পরিচালনা খুঁটিনাটি, সবকিছু সম্পর্কে তাঁরা আমাদের অবহিত করেছেন যেন পথ হারিয়ে না ফেলি। মানব সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোকে তারা নিষিদ্ধ করেছেন। আসুন দেখা যাক এ ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কী সমাধান দেয়।

ইসলাম আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন হয় **পুরুষ অথবা নারী** হিসেবে। এর বাইরে **তৃতীয় লিঙ্গ, ট্রান্সজেন্ডার** বা অন্য যা কিছু আছে সেগুলো **মানুষের তৈরি করা শ্রেনীবিভাগ**। ব্যক্তির কী **"মনে হয়"**, সেটা নয় বরং ইসলাম **দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে** মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। **যারা হিজড়া অর্থাৎ যাদের শারীরিক ত্রুটি আছে, তাদের শরীরেও পুরুষ বা নারী কোন একটি দিকের প্রাধান্য থাকে, এবং সেটা অনুযায়ী তাদের বিচার করা হয়।**

রাসূলুল্লাহ ﷺ দৈহিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের কাছাকাছি এমন হিজড়াদের **পুরুষ** ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য নারীদের কাছাকাছি এমন হিজড়াদের **নারী** হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। [সুনানে বাইহাকী কুবরা, হাদীস নং ১২৯৪]

নারী পুরুষের পরস্পরের বেশ ধারণ করা নিষিদ্ধ। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন:

"রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদের এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদের অভিশাপ দিয়েছেন।" [সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪২৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন,

"আল্লাহ সেসব মানুষদের উপর অভিসম্পাত করেছেন যারা তাঁর সৃষ্টিতে বিকৃতি আনে।" [বুখারি, হাদিস : ৪৮৮৬]

ট্রান্সজেন্ডারের অবশম্ভাবী পরিণতি হলো সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌন বিকৃতি। সমকামিতা জঘন্য অপরাধ। এ অপরাধের কারণে আল্লাহ লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন "আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয় ।"[ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং ১৬৮০৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬৫]

শৈশবে বিপরীত লিঙ্গের পোষাক পরা, সাজগোজ করা, যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া, সমকামী অশ্লীল ভিডিও দেখা ইত্যাদি কারণে কোনো কোনো ব্যক্তির সমলিঙ্গের প্রতি ক্ষণিক আকর্ষণ জন্মাতে পারে, অথবা আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে তৈরি হতে পারে বিভ্রান্তি। **এটা একধরণের মানসিক সমস্যা, বিকৃতি।** পশ্চিমা সমাজেও **কিছুদিন আগ পর্যন্ত** এটাকে মানসিক সমস্যা হিসেবেই বিবেচনা করো হতো।

কারও মধ্যে অসুস্থতা থাকলে, কারও সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমরা তাদের দূরে ঠেলে দেবো না। কারও প্রতি নাইনসাফী করবো না। এমন মানুষদের উপর **আক্রমণ না করে, কটূ কথা না বলে চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন।**

কিন্তু তাই বলে **স্বাধীনতা, কিংবা সহিষ্ণুতার নামে আমরা অসুস্থতাকে মেনে নিতে পারি না।** মানসিক অসুস্থতা আর অস্বাভাবিক আচরণকে স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি দিতে পারি না। এটা অসম্ভব। অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিকতা বলা হলে, অসুস্থতাকে সুস্থতা বলা হলে তা পুরো সমাজকে অসুস্থ করে তুলবে। অস্বাভাবিকতার স্বীকৃতির অর্থ হলে সেটার প্রসার। এতে করে যারা অসুস্থ তাদের উপকার হবে না, বরং দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি হবে। অপরিমেয় ক্ষতি হবে সমাজেরও।

যা যা করা যেতে পারে-

১। ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুর ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দল মত ধর্ম নির্বিশেষে **সবাইকে সচেতন করা।**

২। কোমলমতি শিশু কিশোরদের ট্রান্সজেন্ডার-এর প্রকৃত **স্বরূপ বোঝানো**। বিপরীত লিঙ্গের **পোষাক** না পরানো। **যৌন নির্যাতনের** হাত থেকে বাচানোর জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

৩। বিকৃতির পক্ষে পাঠ্যবই এবং মিডিয়ার **প্রচারণার** ব্যাপারে নিজে সতর্ক হওয়া। **নিজ সন্তান, পরিবার ও সমাজকে সতর্ক করা।**

৪। পাঠ্যবইয়ে এই জঘন্য **বিষ প্রবেশ করানোর বিরুদ্ধে অবস্থান** নেয়া। অভিভাবকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে **সম্মিলিতভাবে** শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন, প্রতিবাদলিপি,সভা সেমিনার,টকশো ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা। আমেরিকা, পোলান্ড, ব্রিটেনসহ অনেক দেশে অভিভাবকেরা এই ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছেন এবং ইতিবাচক ফলাফলও পেয়েছেন। আমাদেরও সচেতন হতে হবে। আমাদের দেশে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করা হবে, **তাও আমাদেরই দেয়া করের টাকায়, এটা মেনে নেয়া যায় না।**

৫। ট্রান্সজেন্ডার বিকৃতির পাশাপাশি **পাঠ্যপুস্তকে ইসলামবিদ্বেষের প্রকাশ এবং ইতিহাস বিকৃতিও ঘটেছে।** এগুলোর বিরুদ্ধেও অবস্থান নেয়া।

অভূতপূর্ব এক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। কোমলমতি শিশু কিশোরসহ সমগ্র জাতিকেই এক মৃত্যুফাঁদে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। সচেতন হতে হবে সবাইকেই...

আপনার সন্তানের নিস্পাপ হাসির জন্য

আপনার ছোটো ভাইবোনের সরলতায় মোড়ানো কৈশোরের জন্য

তাবৎ শ্বেত শুভ্রতা আর পবিত্রতার জন্য

হাজী শরীয়তউল্লাহ, তিতুমীর আর অসংখ্য শহীদের রক্ত দিয়ে কেনা এই যমীনের জন্য,

রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্য, তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য।

প্রচারেঃ সচেতন জনসমাজ

শিশু-কিশোরদের পাঠ্যপুস্তকে বিকৃতির শিক্ষাঃ

ট্রান্সজেন্ডার বিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

পৃথিবীর জীবনের বিশুদ্ধতম আনন্দের উৎস কী? সন্তানের নিস্পাপ ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা? ফোকলা দাঁতের হাসি কিংবা আধো আধো বুলি?

অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকেই এমন উত্তর পাওয়া যায়। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষ অসাধ্য সাধণ করে। নিজের জীবনের সকল সুখ আহ্লাদ ত্যাগ করে। গাধার খাটুনি খাটে। নিজের শত কষ্ট, শতো সীমাবদ্ধতার পরেও পরম ভালোবাসা,যত্ন আর মমতায় রাঙ্গিয়ে দেবার চেষ্টা করেন শৈশব কৈশোরের প্রতিটি মুহূর্ত।

কিন্তু যাদের সুখের জন্য, সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আপনি নিজের জীবনকে বিসর্জন করেছেন **তাদের জীবনকে বিষিয়ে দেবার আয়োজন করা হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে - তা কি আপনি জানেন?** সপ্তম শ্রেনীর বইতে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতার নামে **পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানী করা ভয়ঙ্কর এলজিবিটি এজেন্ডার (LGBT Agenda) বিষ প্রবেশ করানো হয়েছে।** সহজ ভাষায় এলজিবিটি এজেন্ডার উদ্দেশ্য অধিকারের নামে অসুস্থতা এবং নানাধরণের যৌন বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB **সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন** বইয়ে ৫১- ৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামের লেখায় ৫১ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফা বলছে,

"আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...

৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে,

"আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্রান্সজেন্ডার"।

৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, **যতক্ষণ না অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে ততক্ষণ যা খুশি তাই করা যায়।** একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি কোনো এক বয়সে নিজেকে নারী দাবী করে তাহলে সে নারী। আবার নারী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবী করে তাহলে সে পুরুষ। এমন আচরণ সমাজের জন্য কোনো ক্ষতিকর নয় এমন দাবী করে যারা এটা মেনে নেবে না তাদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছে সেখানে।

এই কথাগুলোর মাধ্যমে **'ট্রান্সজেন্ডার' (transgender) নামক মানসিক অসুস্থতা ও বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।** পাশাপাশি বইতে হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডারকে একই (সমার্থক) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে হিজড়াদের প্রতি থাকা সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্য।

ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া দুটি এক না। সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

অভিধান অনুযায়ী **হিজড়া** শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ট্রান্সজেন্ডার নয়, বরং Hermaphrodite বা Intersex। পার্থক্যটা শুধু অভিধানের পাতায় না। বাস্তবেও এ দুয়ের মাঝে আছে বিশাল ফারাক।

আমাদের সমাজে হিজড়া বলতে বোঝানো হয় এমন কোন মানুষকে যিনি জন্মগতভাবেই শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন অথবা যাদের ক্রোমোসমগত

কোন অস্বাভাবিকতা থাকে। **অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার হল এক ধরণের মানসিক সমস্যা।** ট্রান্সজেন্ডার হলো এমন একদল মানুষ **যাদের শারীরিক কোনো ত্রুটি নেই,** কিন্তু ছেলে হয়েও নিজেদের মেয়ে বা মেয়ে হয়েও নিজেদের ছেলে দাবী করে।

সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী প্রতি ২০০০ জনে ১ জন মানুষ ইন্টারসেক্স বা হিজড়া হয়। জনসংখ্যার ০.০৫%। এছাড়া বাকি ৯৯.৯৫% মানুষ হয় নারী অথবা পুরুষ। **ট্র্যান্সজেন্ডার এবং ইন্টারসেক্স, দুটো আলাদা জিনিস।**

"একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি কোনো এক বয়সে নিজেকে নারী দাবী করে তাহলে সে নারী। আবার নারী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবী করে তাহলে সে পুরুষ" - **এধরণের কথার কোন বাস্তবিক কিংবা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই।**

ট্রান্সজেন্ডার অসুস্থতায় ভোগা অনেকে সার্জারির মাধ্যমে যৌনাঙ্গ পরিবর্তন করে। অনেকে নানা ধরণের হরমোন ব্যবহার করে যেগুলো দীর্ঘমেয়াদে নানা ধরণের ক্ষতি করে। এগুলোর নানা ধরণের শারীরিক ও মানসিক জটিলতা তৈরি হয়। মিডিয়া আর শিক্ষাব্যবস্থার ব্রেইনওয়াশিং এর ফলে হয়ে বিগত ৭/৮ বছরে পশ্চিমা বিশ্বে এধরণের সার্জারি আর হরমোনের ব্যবহার হুট করে বহুগুনে বেড়েছে। **সার্জারি করার পর ভুল বুঝতে পারে অধিকাংশই। কিন্তু ফেরার পথটা বড়ই কঠিন।**

"আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে। আমি বোকা ছিলাম। লিঙ্গ পরিবর্তন ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। আমি নিজেই আমার জীবনটা ধ্বংস করেছি"

- **ক্রিস বেক** (৫৫), প্রথম প্রকাশ্য ট্রান্সজেন্ডার ইউএস নেভি সিল।

[ডেইলি মেইল, ১২.১২. ২০২২] https://tinyurl.com/usbake

লিঙ্গ পরিবর্তনের পর পূর্বের লিঙ্গে ফেরত যাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরা হতাশ, আত্মহত্যা প্রবণ।

- **মিরোশ্লাভ জরডজেভিক** , ইউরোলোজিস্ট, বিশেষজ্ঞ লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জন।

[নিউজউইক,১০.৩.১৭] https://tinyurl.com/surgon

ট্রান্সজেন্ডারবাদের হাত ধরে আসে সমকামিতা আর অন্যান্য বিকৃত যৌনতা। এবং সমকামিতার সকল উপসংহার- এইডস,মাংকিপক্স এর মতো প্রাণঘাতী অসুখ হতাশা,আত্মহত্যা, শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ,সহিংসতা। পাশাপাশি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে নিজের শরীর, পরিচয়, সব বদলানোর চিন্তা করা মানুষের অনেকেরি গভীর হতাশাসহ (ডিপ্রেশন) অন্যান্য মানসিক সমস্যায় ভোগেন।

১০ বছর গবেষণার পর প্রাপ্ত তথ্যমতে,ট্রান্সজেন্ডার কিশোর কিশোরী সাধারণ কিশোর কিশোরীদের তুলনায়-

- ছয়গুন বেশী উদ্বিগ্নতায় ভোগে
- তিনগুন বেশী হতাশার ঔষুধ খায়
- ছয়গুন বেশী আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা থেকে হাসপাতালে ভর্তি হয়

[The American Journal of Psychiatry https://tinyurl.com/transstat1]

শিশুকিশোররা সহজে প্রভাবিত হয়, নতুন জিনিসের প্রতি তাদের থাকে সহজাত আগ্রহ। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি কিশোরদের সামনে বিকৃতি ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরছে গনশত্রুরা। বয়ঃসন্ধিকালে এমনিতেই নানা মনস্তাত্তিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। তার উপর লিঙ্গ নিয়ে এমন বিভ্রান্ত ধারণায় মগজ ধোলাই কিশোর কিশোরীদের জীবন বিষিয়ে দেবে। জন্ম নিবে নানা ধরণের অসুখ ও অসঙ্গতি।

পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচারের পরের ধাপ হল এই **অসুস্থতার সামাজিক ও আইনী বৈধতা।** পশ্চিমা বিশ্বে এভাবেই বিষয়টি এগিয়েছে। আর আমাদের দেশে এগুলোর প্রচার ও প্রসার চলছে পশ্চিমেরই মদদে।

সপ্তম শ্রেণীর বইতে বলা কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানী করা। **যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কারও ক্ষতি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যা খুশি করা যায়** - এই মূলনীতির মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বে **সমকামিতা,** "সমকামি বিয়ে" থেকে শুরু করে **ব্যভিচারসহ** প্রায় সব ধরণের **বিকৃত** যৌনাচার ও জীবনাচরণকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। পরিবার ভেঙ্গে পড়েছে। অর্ধেকের বেশি **সন্তানের জন্ম হচ্ছে জারজ** হিসেবে।

- ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, সুইডেন এবং নরওয়ের মতো দেশে ৫০% এর বেশি নবজাতকদের জন্ম হয় জারজ বা বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের ফসল হিসেবে। অ্যামেরিকাতে মোট নবজাতকদের ৪০% জারজ [সূত্রঃ Statista, https://tinyurl.com/4a5z4khh]
- অ্যামেরিকার ১১-২৬ বছর বয়েসীদের ১৭% বিকৃত যৌনতায় অভ্যস্থ [সূত্রঃ গ্যালাপ, https://tinyurl.com/gallup21lgbt]
- জার্মানির প্রতি ৪ জন বৃদ্ধ নাগরিকের ১ জন মাসে মাত্র একবার অন্য মানুষের সাক্ষাত পায়, অনেকে তাও পায় না। আমেরিকায় প্রতি ৩ জন বৃদ্ধের ১ জন একাকী বসবাস করে(সমকামী,ট্রান্সদের মধ্যে এ হার আরও বেশী)। ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় মারা যায় বৃদ্ধাশ্রমে বা একাকী ফ্ল্যাটে। [সূত্রঃ tinyurl.com/usoldhome tinyurl.com/germanold]
- আমেরিকায় ৫ জনে ১ জন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে [সূত্রঃtinyurl.com/usasui]
- সবচেয়ে হতাশাগ্রস্থ দেশের তালিকার ১ নম্বরে ইউক্রেন ২ নম্বর আমেরিকা ৪ নম্বর অস্ট্রেলিয়া [সূত্রঃ tinyurl.com/deprate]

আমরা কি আমাদের সন্তানদের জন্য এমন ভবিষ্যৎ চাই? আমরা কি চাই এমন সমাজ? আমরা কি এই মূলনীতি অনুসরণ করে পাশ্চাত্যের মতো সমকামিতা, ব্যভিচার সবকিছুকে গ্রহণযোগ্য বানাতে চাই?

না, আমরা অবশ্যই এমন পরিণতি চাই না। কিন্তু পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে এই বিষ ঢেলে দেয়া হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্মের চিন্তায়।

৮.৪: সমকামিতা ভয়াবহতা

সানজিদা তামান্না নিঃসন্তান দম্পতি। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ফটিকছড়ি মাইজভান্ডার দরবার শরীফে যেয়ে বাবার কাছে সন্তান লাভের জন্য কান্নাকাটি করবেন। একদিন তারা বাবার দরবারে গেলেন সেখানে তারা সিজদায় রত অবস্থায় বাবাকে স্মরণ করে দু'আ করলেন এবং সন্তান কামনা করলেন। দরবারে অবস্থানরত জনৈক এক ব্যক্তি তাদের এ কর্মকান্ড দেখে বললেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে চরম জুলুম করেছ যা ক্ষমার অযোগ্য।

=============

উপরের এই তথ্যটি ২০২৩ সালে নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ১ নং প্রশ্ন থেকে। কি সুন্দর করেই না কোমলমতি শিশুদের মস্তিষ্কে সমকামিতাকে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে।

সমকামিতার মতো জগন্য পাপ পৃথিবীতে শুরু করেছিলো লূত আ: এর বংশধররা। তাদের নবী লূত আ: তাদেরকে বারবার সতর্ক করার পরও তারা এই ঘৃণ্য পাপ থেকে সরে আসে নি। তাই আল্লাহ তাদেরকে জমিনের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে মহান রব্বুল আলামীন এ কথা তুলে ধরেছেন –

وَلُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمۡ بِهَا مِنۡ اَحَدٍ مِّنَ الۡعٰلَمِیۡنَ ٨٠

আর আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম। যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, 'তোমরা এমন নির্লজ্জতার কাজ করছ যা বিশ্বজগতে তোমাদের পূর্বে কোন একজনও করেনি।'

—সূরা আ'রাফ:৮০

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আহলে সুদূমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি সুদূমবাসীকে আল্লাহর দিনে ডাকতেন এবং সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন। তারা এমন নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজের আবিষ্কার করেছিল যা হযরত আদম (আঃ) থেকে

নিয়ে আজ পর্যন্ত তাদের ছাড়া অন্য কোন জাতি সেই কাজে লিপ্ত হয়নি। তারা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের কাছে কু-কাজের জন্যে আসতো। এ কাজের কল্পনা আজ পর্যন্ত কারো মনেও জাগ্রত হয় নি এবং আজ পর্যন্ত বানী আদম এ কাজে কখনও জড়িত হয়নি।

অথচ সেই একই ঘৃণ্য কাজ এই উম্মাহর মধ্যে প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে এবং এক শ্রেণী তা ছড়িয়ে দিতে উঠেপড়ে লাগছে।

লূত আ: বারবার সতর্ক করার পরও তার জাতি এ রকম ঘৃণ্য অপরাধ থেকে ফিরে আসে নি। অত:পর তারা সকলেই আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হয়।

قَالُوۡا یٰلُوۡطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنۡ یَّصِلُوۡۤا اِلَیۡکَ فَاَسۡرِ بِاَہۡلِکَ بِقِطۡعٍ مِّنَ الَّیۡلِ وَ لَا یَلۡتَفِتۡ مِنۡکُمۡ اَحَدٌ اِلَّا امۡرَاَتَکَ ؕ اِنَّہٗ مُصِیۡبُہَا مَاۤ اَصَابَہُمۡ ؕ اِنَّ مَوۡعِدَہُمُ الصُّبۡحُ ؕ اَلَیۡسَ الصُّبۡحُ بِقَرِیۡبٍ ٨١

আগুন্তুকরা বলল, 'হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত বার্তাবাহক, তারা তোমার কাছে কক্ষনো পৌঁছতে পারবে না, কাজেই কিছুটা রাত বাকী থাকতে তুমি তোমার পরিবার-পরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড়, তোমাদের কেউ যেন পিছনের দিকে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী (তোমাদের সঙ্গী হতে পারবে না) তারও তাই ঘটবে, অন্যদের যা ঘটবে। সকাল হল তাদের (শাস্তি আসার) নির্ধারিত সময়, সকাল কি নিকটবর্তী নয়?'

—সূরা হুদ:৮১

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অবধারিত ফলাফল হলো সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ এবং বৈধতা দেওয়া। মনে করুন, জামাল নামের এক পুরুষ নিজেকে নারী বলে দাবি করা শুরু করলো। আইন তাকে নারী বলে মেনে নিলো। এখন বিয়ে কিংবা যৌনচাহিদা মেটাতে গিয়ে সে কী করবে?

সে যদি কোনো পুরুষকে বেছে নেয়, তাহলে সেটা হবে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা। কারণ পুরুষ যদিও নিজেকে নারী দাবি করছে, কিন্তু আসলে সে একজন পুরুষ সে

যাকে বেছে নিয়েছে সেও পুরুষ। কাজেই এটা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা। যদিও দূর থেকে তাদের স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা মনে হয়।

আমাদের সুশীল সমাজের কতশত লোক কৌশলে এই জগন্য কাজকে রাইট রাইট বলে চিল্লাচ্ছেন। তাদেরকে সহযোগিতা করছেন,তাদের হয়ে আওয়াজ তুলছেন। তাদের কথা নাই বললাম। সমকামিতা বা এলজিবিটির সাইন রেইনবো।

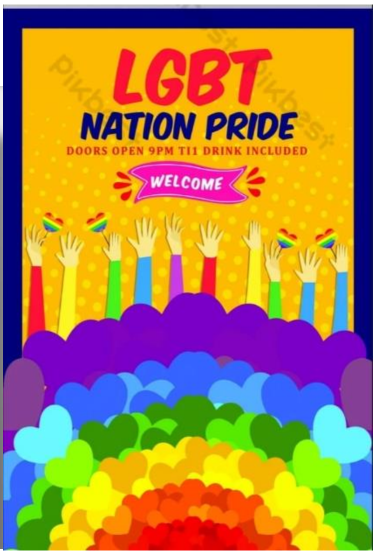

এই ট্রান্স এবং এলজিবিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে

https://www.facebook.com/mohammad.hossain.182?mibextid=ZbWKwL

সরোয়ার স্যারকে ফলো করতে পারি। এছাড়া বিভিন্ন বইয়ে বিস্তারিত জানতে পারি

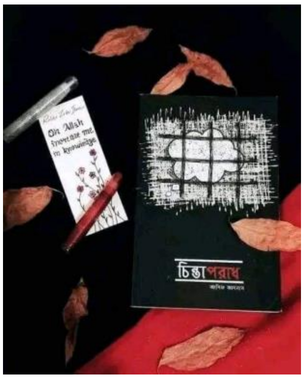

৮.৫: হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যঃ

হিজড়া

১। এটি জন্মগত সমস্যা। ল্যাব টেস্ট করে এটি প্রমাণ করা যায়। ২। এটি খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। প্রতি ৫০০০ শিশুর মধ্যে ১ জন হিজড়া হতে পারে। ৩। একটি শিশু অস্পষ্ট বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গ নিয়ে জন্মাতে পারে। এমনকি কারো কারো ক্ষেত্রে ২০-২৫ বছর বয়সেও শারীরিক পরিবর্তন (বয়ঃসন্ধি) হতে পারে। ৪। অবিকল মেয়ে হিসেবে বড় হতে থাকে কিন্তু তখনই বুঝা যায় সে আসলে পুরুষ, যখন বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাসিক বা রক্তস্রাব শুরু হচ্ছে না। ৫। এরা সন্তান জন্ম দিতে পারে না।

ট্র্যান্সজেন্ডার

১। এটি মানসিক অবস্থা যার সাথে জন্মগত লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই। একজন ছেলে বা মেয়ে নিজেকে 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে' বলে মনে করে।

২. এটি ল্যাব টেস্ট করে প্রমাণ করা যায় না।

৩। হরমোন ট্রিটমেন্ট অথবা সার্জারী করে ট্র্যান্সজেন্ডার হলো কিনা তা মুখ্য নয়,নিজেকে পুরুষ অথবা নারী দাবি করাটাই মুখ্য বিষয়।

৪। সার্জারী করে জরায়ু বানানো যায় না, আবার কার্যকরী পুরুষাঙ্গও তৈরী করা যায় না যা দিয়ে বীর্যপাত হয়।

৫। গবেষণা অনুসারে, মাত্র ২০% ট্রান্সপুরুষ/নারী সার্জারি করে নিজেদের যৌনাঙ্গ পরিবর্তন করে। বাকি ৮০ পৃষ্ঠা ৪০ও/নির্ভেজাল্টটশ বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করতে থাকে।

৬। ট্র্যান্সজেন্ডাররা মূলত সমকামী, আবার উভকামীও হতে পারে।

★অধ্যায় ৯: পুঁজিবাদী শিক্ষা

আমরা সবাই ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সেই বিখ্যাত উক্তিটি জানি *"তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও,আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি উপহার দিবো"*

নেপোলিয়ানের কথা খুব চলে: শিক্ষিত মা দাও, শিক্ষিত জাতি দিচ্ছি। পুঁজিবাদী শিক্ষা তো মা- কে জার্নালিজম শেখাচ্ছে। জার্নালিজম শিখে মা বাচ্চাকে কি শিক্ষিত করবে। যদি শিক্ষিত জাতিই দরকার হয়, তাহলে শেখানো দরকার ছিলো 'চাইল্ড এডুকেশান', 'নিউট্রিশন', চাইল্ড সাইকোলজি' এগুলা। আর মা কে শিখিয়ে পাঠাচ্ছ জবে, সারাদিন।

আর এদিকে বুয়ার কাছে জাতি খুব শিক্ষিত বিবেকবান হচ্ছে, না কি?

আমার ডিগ্রি পুঁজিবাদের কাজে আসছে। পাবলিকের সার্ভিসে লাগছে। ভেবে দেখ, আমি মাস্টার্স পাশ, ফার্স্ট ক্লাস। আমি ৯ টা থেকে ৫ টা ব্যাংকে, আর আমার সন্তানকে

পড়াচ্ছে মেট্রিক - ইন্টার পাশ করা মানুষ। তা হলে শিক্ষিত জাতি গঠনে আমার-ডিগ্রির কি ফায়দা?

শামসুল আরেফিন শক্তি বইঃ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০

সুতরাং বুজাই যাচ্ছে জাতি গঠনে একজন মায়ের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আর জাতির সাথে রাষ্ট্রের ভূমিকা জরিত।

★অধ্যায় ১০: ইসলামের প্রথম যুগে সামাজিক পরিবর্তন

মহানবী সাঃ এর হিজরতের পর থেকে খোলাফায়ে রাশেদিন পর্যন্ত সমসাময়িক সময়ে ইসলামের অধীনে অনেক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন সামাজিক সুরক্ষা, পারিবারিক কাঠামো, দাসত্ব ও নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তনগুলো আরবের বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার নানাভাবে উন্নয়ন করেছিল।

উদাহরণস্বরূপ, বার্নার্ড লুইসের মতে, ইসলাম "প্রথম অভিজাতদের সুবিধাভোগের সমালোচনা করেছে, শ্রেণিবিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং মেধাভিত্তিক জীবিকার পথ উন্মোচন করার পন্থা গ্রহণ করেছে"।

(Shi'ism,Resistance and Revolution,p:21-30)

লীলা আহমেদ মনে করেন, ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, প্রাক-ইসলামিক আরবে ইতিমধ্যেই নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে অনেকগুলো একই ধরনের প্রগতিশীল রীতিনীতি ছিল যার জন্য লুইসের মতো পণ্ডিতগণ ইসলামকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন।

(Journal of women in culture and society 11(4):665-691)

তবে অন্যান্য পণ্ডিতরা তাঁর এই বক্তব্যের সাথে একমত নন।

১০.১: ইসলামের আগমন

বার্নার্ড লুইসের মতে, ইসলামের আগমন একটি বিপ্লব ছিল যা আংশিকভাবে সফল হয়েছিল নতুন ধর্ম এবং মুসলমানরা যে বহু পুরানো সমাজগুলো দখল করেছিল তার মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনার কারণে। তিনি মনে করেন, এই জাতীয় উত্তেজনার ক্ষেত্র ইসলামী মতবাদের সমতাবাদী প্রকৃতির পরিণতি ছিল। ইসলাম "প্রথম অভিজাতদের সুবিধাভোগের সমালোচনা করেছে, শ্রেণিবিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মেধাভিত্তিক জীবিকার পথ উন্মোচন করার নীতি গ্রহণ করেছে"। লুইস অবশ্য উল্লেখ করেছেন, ইসলামে সাম্যতা শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন পুরুষ মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তবে এটি "গ্রেকো-রোমান এবং প্রাচীন ইরানীয় উভয় বিশ্বের রীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করেছিল"।(Shi'ism,Resistance and Revolution, p:21-30)

বার্নার্ড লুইস মুহাম্মদের সাফল্যের তাৎপর্য সম্পর্কে লিখেছেন:(" The Arabs in history. Speculum 26(3):522)

> তিনি বেশ কিছু অসাধারণ অর্জন করেছিলেন। পশ্চিম আরবের পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের কাছে তিনি একটি নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন যা এর একেশ্বরবাদ এবং এর নৈতিক মতবাদের মধ্য দিয়ে পৌত্তলিকতার চেয়ে অপ্রত্যাশিত উঁচু স্তরে দাঁড়িয়েছিল। তিনি সেই ধর্মকে প্রচারের মাধ্যমে এমনভাবে উন্মোচিত করেছিলেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে অগণিত লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসীকে জীবন ও চিন্তার পাথেয় হিসেবে অনুসরণ করতে হবে। তবে তিনি এর চেয়ে আরও বেশি কাজ করেছিলেন; তিনি একটি সম্প্রদায় এবং একটি সুসংগঠিত ও সশস্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার শক্তি ও প্রতিপত্তি তাকে আরবের একটি প্রভাবশালী কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। ”

১০.২: মদিনা সংবিধান

মদিনা সংবিধান মদিনা সনদ নামে পরিচিত। ৬২২ হিজরীতে মোহাম্মদ সাঃ এর খসড়া প্রণয়ন করেন। এটি মূলত মোহাম্মদ সাঃ ইয়াসরিব (তথা বর্তমান মদিনা) এর বসবাসরত সকল গোত্র ,ইয়াহুদী ও পোত্তলিক পরিবারের মধ্যে একটি সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক চুক্তি ছিল। মদিনার প্রধান দুটি গোত্র আউস ও খাজরাজ এর মধ্যে চিরস্থায়ী যুদ্ধ বন্ধের জন্য সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে দলিলটি প্রণয়ন করা হয়। ফলে এই শহরটি মদিনায় বসবাসরত মুসলিম, ইয়াহুদী ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়কে একটি সম্প্রদায়-উম্মাহ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের জন্য বিবিধ অধিকার ও দায়িত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

মদিনা সনদের সুনির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে তবে পন্ডিতগণের মতে 622 হিজরির কিছু পরে এই সনদ লেখা হয়েছিল। এর মধ্য দিয়েই প্রথম কার্যকরী ভাবে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংবিধান জনসাধারণের সুরক্ষা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, পবিত্র স্থান হিসেবে মদিনার ভূমিকা সব ধরনের অস্ত্র সহিংসতাকে নিষিদ্ধ করে), নারীদের সুরক্ষা, মদিনার অভ্যন্তরে শান্তিপূর্ণ গোত্রীয় সম্পর্ক, সংঘাতের সময় জনগণের উপযোগী কর ব্যবস্থা, বহিরাগত রাজনৈতিক জোটসমূহের স্থিতিমাপক, ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিতের ব্যবস্থা, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিচার ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রিত রক্তপণ প্রদান (পরিবার বা গোত্রের মধ্যে লেক্স টালিওনিসের বা প্রতিশোধমূলক আইন বা সমশাস্তি বিধির পরিবর্তে একজন ব্যক্তিকে হত্যার ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদেয় অর্থ) ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল।

১০.৩: সামাজিক পরিবর্তন

জন এস্পোসিতো মুহাম্মদকে এমন এক সংস্কারক হিসেবে দেখেন যিনি কন্যাশিশু হত্যা, দরিদ্রদের শোষণ, সুদ, হত্যা, মিথ্যা চুক্তি, পরকীয়া, ব্যভিচার এবং চুরির মতো পৌত্তলিক আরবের প্রচলিত প্রথাসমূহের কঠোর নিন্দা করেছিলেন।(Islam The Straight Path) তিনি বলেন, " প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে গোত্রীয় রীতিনীতিভিত্তিক আইনের

প্রতি দায়বদ্ধ নয় বরং এক ঐশ্বরিক আইনের প্রতি দায়বদ্ধ- এ বিষয়ের প্রতি মুহাম্মদের গুরুত্বারোপ তৎকালীন আরব সমাজের মূল ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল ... মুহাম্মদ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের এক সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন যা ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি, ব্যবসায়িক চুক্তি এবং অনুশীলন, নারী-পুরুষ এবং পারিবারিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল"(New Yourk-Oxford University Press) এস্পোসিতো মনে করেন, কুরআনের সংস্কারগুলো "বিধি বা নৈতিক নির্দেশনা সম্পন্ন যা বিদ্যমান প্রথা বা রীতিনীতিসমূহকে নিষিদ্ধ বা প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে সীমাবদ্ধ করেছে বা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেছে।" তিনি দাসত্ব এবং নারীর মর্যাদাকে দুটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কিছু পণ্ডিতের মতে, মুহম্মদের শিশু হত্যার নিন্দা করাই তৎকালে নারীর মর্যাদা বাড়াতে তাঁর প্রয়াসের মূল দিক ছিল।কুরআনে এ প্রথার সম্বোধনে একটি উল্লেখযোগ্য আয়াতে বলা হয়েছে: "যখন সূর্য নিষ্প্রভ হবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে, পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে, যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য পশুগুলো একত্রিত হবে, যখন সমুদ্রগুলোকে উদ্বেলিত করা হবে, যখন আত্মারা মিলিত হবে, যখন জীবন্ত প্রোথিতা কন্যা (মাওদাতু) কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল, যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে ..."[কুরআন ৮১: ১], যদিও একটি হাদিস. [Islam and Christian -Muslim Relationsl5(3):123-146] বিশেষ প্রক্রিয়ার জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাথে বিষয়টিকে সংযুক্ত করেছে।

এই সময়কালে লিঙ্গভিত্তিক হত্যার প্রকৃত ব্যাপকতা কতটুকু ছিল সে বিষয়টি অনিশ্চিত। ডোনা লি বোভেন এনসাইক্লোপিডিয়া অফ কুরআনে লিখেছেন, "প্রাক-ইসলামী আরবদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট শব্দ 'ওয়াদ' খুব সাধারণভাবেই ছিল,,(Encyclopedia of Quran)কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে এটি একসময় প্রচলিত ছিল, তবে ইসলামের আগমনের সময় এটি অনেকখানি কমে এসেছিল আবার অনেকে মনে করেন, ইসলামের আগে এবং পরে একেবারে নিঃস্ব পরিবারগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণের

মাধ্যম হিসাবে এর অনেকটা নিয়মিত ব্যবহার ছিল।[Giladi,Avner(1990-05)," Some Observations on Infanticide In Medieval Society "]

যদিও মুসলমান এবং পাশ্চাত্যের অনেক লেখকের বর্ণনায় এই ধারণাটিই খুব সাধারণভাবেই লক্ষ্যণীয় যে, প্রাক-ইসলামী আরবে নিয়মিতভাবে কন্যাশিশু হত্যার রীতি ছিল। তবে কিছু কিছু বিদ্যমান সূত্রমতে এই প্রথার কথা উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে । ইয়েমেনের প্রায় ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের একটি শিলালিপিতে এই প্রথা নিষিদ্ধ করার উল্লেখ পাওয়া যায় যা প্রাক ইসলামী যুগে এ সংক্রান্ত একমাত্র নজির। যদিও সেই সময়কাল সম্পর্কেও তথ্যের অভাব রয়েছে তাই নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়।সহিহ্ মুসলিম এর সূত্রগুলোতে এমন কিছু ব্যক্তির নাম রয়েছে যারা শিশু হত্যার ক্ষেত্রে অংশ নেওয়া, পর্যবেক্ষণ করা বা হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে জড়িত ছিলেন, যেমন [আসমা বিনতে আব] বর্ণিত একটি হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী জায়েদ ইবনে আমরের কথা জানা যায়।(Hadith:piety and law)

১০.৪: সামাজিক নিরাপত্তা

উইলিয়াম মন্টগোমেরি ওয়াট বলছেন, মুহাম্মদ একজন সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারক ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে, মুহাম্মদ "সামাজিক সুরক্ষার একটি নতুন ব্যবস্থা এবং একটি নতুন পারিবারিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন যা পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় বিরাট উন্নয়ন ছিল। বেদুঈন নৈতিকতার মাঝে সর্বোত্তম যা ছিল তাকে গ্রহণ করে এবং একটি স্থায়ী সম্প্রদায়ের জন্য তার আত্মীকরণ করে তিনি বিবিধ বর্ণের মানুষের জীবনাচরণের জন্য একটি ধর্মীয় এবং সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।(" W.Montgomery Watt:Muhammad. Prophet and Statesman. Oxford 1961)

১০.৫: দাসপ্রথা

কুরআনে দাসপ্রথা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অসংখ্যবার উল্লেখ রয়েছে ([কুরআন ২:১৭৮], [কুরআন ১৬:৭৫], [কুরআন ৩০:২৮]), তবে এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিদ্যমান বিধানকেও স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। লুইস বলেছেন যে, ইসলাম প্রাচীন দাসত্বের ক্ষেত্রে দুটি বড় পরিবর্তন এনেছিল যা সুদূরপ্রসারী প্রভাব তৈরি করেছিল। "এর মধ্যে একটি হল স্বাধীনতার সম্ভাব্যতা; অন্যটি কঠোরভাবে নির্দেশিত পরিস্থিতি ব্যতীত মুক্ত ব্যক্তিদের দাসত্বের উপর নিষেধাজ্ঞা," লুইস আরও বলেছেন, আরবে ক্রীতদাসদের অবস্থান "ব্যাপক উন্নত" হয়েছিল। আরবের দাস "শুধুমাত্র ভূমিদাস রইল না বরং কিছু নির্দিষ্ট ধর্মীয়, সামাজিক মর্যাদা এবং আপাত-আইনী অধিকার সম্পন্ন মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হল।" [Oxford University press, p:3-15]

লুইস বলেছেন, মুসলিম ভূমি দাসদের একটি নির্দিষ্ট আইনী মর্যাদা ছিল সেই সাথে তাদের মালিকদেরও অধিকার ছিল তেমনি কিছু বিধিনিষেধও ছিল যা প্রাচীন বিশ্বের দাসত্বের ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতির পরিচায়ক। এই সংস্কারগুলোর জন্যই ইসলামী সাম্রাজ্যের দাসত্বের প্রথা " উত্তরাধিকার সূত্রে রোম এবং বাইজান্টিয়াম থেকে প্রাপ্ত ব্যাপক উন্নতির প্রতিনিধিত্ব করেছিল।"[Oxford University press, p:3-15]

যদিও কুরআনে দাসত্ব প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিবেশী সংস্কৃতিগুলোর দাসত্বের মধ্যে অনেকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তবে কুরআনের দাসত্বের কিছু অনন্য নতুন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইতিহাস ও ধর্ম বিষয়ক অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক জোনাথন ব্রোকপ্পের মতে, দাসমুক্তির জন্য ভিক্ষা প্রদানের ধারণাটি কুরআনে অনন্য (আয়াতগুলোর ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা অনুমান করে [কুরআন ২: ১৭৭]এবং [কুরআন ৯:৬০]। একইভাবে, কিছু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দাস মুক্ত করার রীতিও কুরআন দ্বারা প্রবর্তিত বলে মনে হয়।[Encyclopedia of Quran] ব্রোকপ্প যোগ করেছেন: "অন্যান্য সংস্কৃতিগুলো কোন দাসের ক্ষতি করার জন্য একজন কর্তার অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে তবে খুব কমই তাদের দাসের সাথে সদয় আচরণ করার পরামর্শ দেয়। অন্যদিকে সমাজের অন্যান্য দুর্বল সদস্যদের মতো একই শ্রেণিতে দাসদের রেখে তাদেরও সকল সুরক্ষার

দাবিদার করার ঘোষণা কুরআনের বাইরে অন্য কোথাও আছে বলে জানা যায় না। তাই কুরআনের অনন্য অবদানটি হচ্ছে, সমাজে দাসের স্থান এবং দাসের প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতার উপর জোর দেওয়া। আর এটি সম্ভবত সে সময়ে দাসত্ব সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রগতিশীল আইন ছিল। [Encyclopedia of Quran]

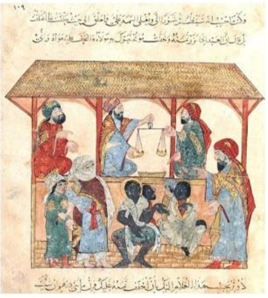

ইসলামীয় ইয়েমেনে একটি ক্রীতদাস বাজার।

১০.৬: নারী অধিকার

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য অনেক লেখক প্রাক-ইসলামী আরবে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তাদের অনুসন্ধানগুলো বিভিন্ন রকম।কিছু লেখক প্রায়শই মুহাম্মদের প্রথম বিবাহ এবং মুহাম্মদের পিতামাতার বিবাহ এবং মক্কায় নারী মূর্তি পূজা করার মতো অন্যান্য বিষয়গুলোকে উল্লেখ করে যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইসলামের আগে নারীরা আরও বেশি স্বাধীন ছিল।

বিপরীতে অন্যান্য লেখকগণ কন্যা শিশু হত্যাকাণ্ড, ব্যাপক বহুবিবাহ, পিতৃগোত্রীয় বিবাহ এবং অন্যান্য প্রথা উল্লেখ করে প্রাক-ইসলামী আরবে নারীদের অবস্থান নিম্নমানের ছিল বলে যুক্তি দিয়েছেন।(Islam:critical concept of sociology)

ভ্যালেন্টাইন মোগাদাম একটি মার্কসবাদী তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে নারীদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে, নারীর অবস্থান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইসলামের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে নাগরিকীকরণ, শিল্পায়ন, মেরুকরণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পৃক্ত রাজনৈতিক প্রবক্তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মোগাদাম মনে করেন, অন্যান্য বিশ্ব ধর্ম বিশেষত হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান এবং ইহুদী ধর্মের তুলনায় ইসলাম বেশি বা কম পুরুষতান্ত্রিক নয়।(American Ethnologist 22(4):1078-1079)(Middle East Studies Association Bulletin 28(3):250-251)

মজিদ খাদদুরি লিখেছেন, আরবে প্রাক-ইসলামী আইনী মর্যাদা অনুযায়ী নারীদের কার্যত কোনও অধিকার ছিল না, যেখানে শরিয়া (ইসলামী আইন) নারীদের বেশ কয়েকটি অধিকার প্রদান করেছিল।(The American Journal of comparative law 26(3):213)জন এস্পোসিতো বলেছেন, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং উত্তরাধিকার ইসলামী সংস্কারগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।(Islam: The straight path) কারেন আর্মস্ট্রংয়ের মতে, পশ্চিমে এবং অন্যান্য অনেক সংস্কৃতিতেই বহু শতাব্দী পরেও নারীদের উত্তরাধিকার এবং বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়নি।(Encyclopedia of religion)অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ ইসলামে বলা হয়েছে, আরবে নারীদের মর্যাদার সাধারণ উন্নয়নে কন্যা শিশু হত্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং নারীর পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।(The Oxford Dictionary of Islam) গারহার্ড এন্ড্রেস বলেছেন: "এই সামাজিক ব্যবস্থা ... বিবাহ, পরিবার এবং উত্তরাধিকারের একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল; যা নারীদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং পাশাপাশি তার এবং তার বাচ্চাদের সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। আইনত নিয়ন্ত্রিত বহু বিবাহ পূর্বের বিবিধ সম্ভাব্য এবং বিদ্যমান শিথিল ব্যবস্থার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অগ্রগতি ছিল; ব্যভিচারের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদানে সহায়ক হিসেবে একমাত্র এই বিধানের মাধ্যমেই পরিবার (যা যে কোনও আবাসিক সমাজের মূল ভিত্তি)কে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করা যেত।"(Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland 120(2):395)

তবে লীলা আহমেদ দাবি করেন, প্রাক-ইসলামী যুগে মক্কায় নারীদের ব্যবসায়ের মালিকানা, একক নারী হিসাবে কাজ করা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদির একাধিক সূত্র রয়েছে। মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজার স্বাধীনতা এবং আর্থিক সাফল্য সম্মন্ধে লীলা আহমেদ এও যুক্তি দেন যে, "তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তার বিবাহের সূচনা এবং এমনকি বিবাহের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করার জন্য একজন পুরুষ অভিভাবকের অনুপস্থিতি (যেমনটি ইসলামের প্রয়োজন হয়)" নিজের থেকে বহু বছর কনিষ্ঠ এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মুহম্মদের একমাত্র স্ত্রী হয়ে থাকা এ সবকিছুই কিন্তু প্রাক-ইসলামী যুগেই ঘটেছিল। তবে তিনি আরো বলেন, ইসলাম নিজে নারীর অধিকার হ্রাস করেনি বরং এটি ছিল সাসানিয়ান ইরাকের পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি যেখানে ইসলামী আইন প্রথম প্রণীত হয়েছিল যা নারী মর্যাদাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।"(Journal of women in culture and society 11(4):665-691)

তবে অন্যান্য সূত্রমতে জানা গেছে যে, প্রাক-ইসলামী আরবে সাধারণ নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত ছিল না বরং তা শুধুমাত্র উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১০.৭: নৈতিক পরিবর্তন

মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের অন্যান্য নবীদের মতই মুহাম্মদকে ঈশ্বর প্রেরণ করেছিলেন মানুষকে তাদের নৈতিক দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং সমাজে ঈশ্বরের ধারণার বিরোধিতা করে এমন ধারণাসমূহের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য। কেলসির মতে, প্রাক-ইসলামী আরবের নিম্নোক্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর বিরুদ্ধে এই চ্যালেঞ্জটি পরিচালিত হয়েছিল:

- আরবদের বিভিন্ন গোত্রীয় বিভাজন (রক্ত ও আত্মীয়তার ভিত্তিতে)। এই শ্রেণিবিন্যাসের মুখোমুখি হল তাকওয়ার (ইসলামভক্তি) উপর ভিত্তি করে সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়ের তথা এক *"উম্মাহর"* আদর্শ।

- আল্লাহ ব্যতীত প্রচুর দেব-দেবীর উপাসনার গ্রহণযোগ্যতা - কঠোর তাওহিদ (ইসলামী একেশ্বরবাদ) দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়; এটি এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা এই নির্দেশ দেয় যে, আল্লাহর ইবাদতের কোন অংশীদার নেই বা কোন সমকক্ষও নেই;
- খ্যাতি অর্জন বা উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বকে এই ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল যে মানবজাতিকে কিয়ামাহ (পুনরুত্থানের দিন) র সময় ঈশ্বরের সামনে জবাবদিহিতার জন্য উপস্থিত করা হবে;
- পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুবর্তী হওয়ার রীতিকে ইসলাম দ্বারা চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল - যা পরিবর্তে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ এবং ওহীর অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়।

এই পরিবর্তনগুলো পরিচয়, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে সমাজের পুনর্গঠনে অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী প্রজন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি আরব উপদ্বীপে সমাজে ও নৈতিক জীবনব্যবস্থায় এক বিশাল পরিবর্তন এনেছিল। মুহাম্মদের সময় যদিও প্রাক-ইসলামী আরব বহু "অবহেলা"র উদাহরণ দিয়েছিল, তবে তা পুরোই অর্থহীন ছিল না। মুহাম্মদ আরব প্রাক-ইসলামী ঐতিহ্যের কয়েকটি বিষয় যেমনঃ নিকটতম আত্মীয়, বিধবা, এতিম এবং দুস্থ ব্যক্তির যত্ন নেওয়া এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মতো কিছু বিষয়কে অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং মেনে চলতে বলেছিলেন। যদিও, এই মূল্যবোধগুলো গুরুত্ব অনুসারে পুনর্বিন্যাস ও কঠোর একেশ্বরবাদের প্রেক্ষিতে স্থাপন করা যেতে পারে।

নীতিশাস্ত্রের এনসাইক্লোপিডিয়া

মুহম্মদের প্রচারের ফলেই "নতুন ধর্মের নিষেধাজ্ঞা এবং ঈশ্বর ও শেষ বিচারের ভয়ের ভিত্তিতে নৈতিক মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল" এবং আরবদের প্রাক-ইসলামীয় গোত্রীয় রীতিনীতিসমূহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল।

(ইসলামী নীতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্রের বিশ্বকোষ)

১০.৮: অর্থনৈতিক পরিবর্তন

মাইকেল বোনার কুরআনে দারিদ্র্য ও অর্থনীতি সম্পর্কে লিখেছেন, কুরআন সমাজে নতুন শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে, যেখানে দরিদ্রদের সাথে আগের তুলনায় আরও ন্যায্য আচরণ করা হয়। ইসলামী তত্ত্বে "দারিদ্র্যের অর্থনীতি" কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং ১৩ ও ১৪ শতাব্দী পর্যন্ত এর অনুশীলন অব্যাহত ছিল । এর মূল উদ্দেশ্য, অংশত দান করবার মধ্য দিয়ে সম্পদ প্রচার ও পবিত্র করার একটি ধারণা, যা দাতব্য, উদারতা এবং দারিদ্র্যের ধারণার একটি স্বতন্ত্র ইসলামিক পদ্ধতিকে উপস্থাপন করে। আর এটি "ধনী-দরিদ্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দান করা সংক্রান্ত খৃষ্টীয় ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।" কুরআনে রিবা নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদ গ্রহণকে বোঝানো হয় সেই সাথে যাকাত ও ভিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছে। সদকা গ্রহণকারীদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি প্রসঙ্গে কুরআনে একবার উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে অন্যান্যরা যেমন অনাথ, পিতা-মাতা এবং ভিক্ষুক সম্পর্কে প্রায়শই উল্লেখ রয়েছে। আত্মীয়স্বজন, দরিদ্র এবং মুসাফির এই তিনের উল্লেখ এখানে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যণীয়।

প্রাক-ইসলামীয় আরব সমাজের বিপরীতে, কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য বিনিময় ও বিধিনিষেধ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক প্রবাহ ব্যবস্থাটি ছিল সবার জন্য প্রযোজ্য, সেখানে পণ্য আদান প্রদানে দাতা ও গ্রহীতা একে অপরকে জানুক বা না জানুক সমাজ স্বাভাবিকভাবে তাই করত যা তার করার কথা। কুরআনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার স্বতন্ত্র ধারায় দারিদ্র্য ও দরিদ্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা নতুনত্বের একটি নিদর্শন। কুরআন বলেছে যে, এই নির্দেশিকা ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা তার অর্থ এবং পণ্যের প্রবাহকে সঠিক দিকে (উপরে থেকে নীচে) নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে উদারতার চর্চা করে। বিস্তৃত অর্থে, কুরআনের অন্তর্নিহিত আখ্যান একটি গোত্রীয় সমাজের শহুরে হয়ে ওঠার কথা বলে। । চার্লস সি টেরি এবং অ্যান্ড্রু রিপ্পিনের মতো অনেক পণ্ডিত কুরআন ও ইসলাম উভয়কে বাণিজ্য ও মধ্য প্রাচ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে উত্থিত চলমান সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল

বলে চিহ্নিত করেছেন। মুসলিম ঐতিহ্য (হাদীস ও ইতিহাসতত্ত্ব উভয়ই) একটি বিষয়কে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে যে, মুহাম্মদ মদিনার বাজারে কেবল তাঁবু ছাড়া অন্য কোনও ভবন নির্মাণের অনুমতি দেননি এবং তিনি সেখানে কোনও কর বা ভাড়া নেওয়ার অনুমতিও দেননি । কোন ধরনের ফি, কর বা ভাড়া প্রদান ছাড়া, স্থায়ী ভবন নির্মাণ ব্যতীত এবং খলিফার পক্ষ থেকে কোনও লাভ গ্রহণ ছাড়া (একসাথে) কোনও একটি স্থানের মধ্যে পণ্য প্রবাহকে সম্পৃক্ত করে একটি "মুক্ত বাজার" এর এই অভিব্যক্তি "স্বেচ্ছাকৃত দান" তথা সাদাকার মূল তত্ত্ব ছিল। অর্থনৈতিক মহাবিশ্বের এই সুসংগত এবং অত্যন্ত আবেদনময়ী দৃষ্টিভঙ্গির সাথেই ইসলামের প্রাথমিক এবং দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যের অন্তর্যোগ ছিল। যেহেতু দরিদ্ররা এই অর্থনৈতিক মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, তাই দারিদ্র্য সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষাসমূহ আরব, নিকট পূর্ব এবং এর বাইরেও ব্যাপক পরিবর্তনে প্রভাব রেখেছিল।

(The Journal of Interdisciplinary History। 35 (3): 391-4061)

১০.৯: নাগরিক পরিবর্তন

কূপ নির্মাণ ও ক্রয়ের আকারে ইসলামে সমাজকল্যাণ শুরু হয়েছিল। মদিনায় হিজরতের পর মুহাম্মদ মাত্র একটি ভাল কূপ ব্যবহারের জন্য পেয়েছিলেন। মুসলিমরা এই কূপ কিনে নেয় ফলে এটি সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য সহজলভ্য হয় । মুহাম্মদের "পানি" সদাকাহ (দাতব্য)র একটি আরও ভাল পন্থা ঘোষণার পরে, তার অনেক সাহাবী নতুন কূপ খননের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। খেলাফতের সময়ে, মুসলিমগণ তাদের বিজিত ভূমিতে অনেকগুলো পুরোনো কূপ সংস্কার করেছিলেন।

(নাদভী (2000), পৃ. 403-4)

কূপ ছাড়াও মুসলিমগণ বহু ট্যাঙ্ক এবং খাল নির্মাণ করেছিলেন। কিছু খাল ভিক্ষু ও অভাবীদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছিল (যেমন তালহা দ্বারা কিনে নেওয়া একটি ঝরণা) এবং বেশিরভাগ খাল সাধারণ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত

ছিল। কিছু খাল বসতিগুলোর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল, যেমন সাদ খাল আনবারে পানি সরবরাহ করত এবং আবির মুসা খাল বসরায় পানি সরবরাহ করত।

(নাদভী (2000), পৃ. 405-6)

দুর্ভিক্ষের সময়, উমর (ওমর ইবনে আল-খাত্তাব) মিশরে একটি খাল নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে নীল নদকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করা যায়। খালের উদ্দেশ্য ছিল আরব থেকে সমুদ্রপথে ও স্থলপথে শস্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা। আমাল ইবনুল-আস দ্বারা এক বছরের মধ্যে খালটি তৈরি করা হয়েছিল এবং আবদুস সালাম নাদিব লিখেছেন, এর মধ্য দিয়ে আরব সর্বকালের দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেয়েছিল।"

(নাদভী (2000), পৃ. 407-8)

১০.১০: রাজনৈতিক পরিবর্তন

আরব

সম্পাদনা

সপ্তম শতাব্দীতে মুহাম্মদের নেতৃত্বে আরবে ইসলামের সূচনা হয়েছিল, যিনি আরবের অনেকগুলো স্বাধীন যাযাবর বা বেদুঈন গোত্রকে ইসলামী শাসনের অধীনে একত্রিত করেছিলেন।

(Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 632-656।)

মধ্যপ্রাচ্য

সম্পাদনা

ইসলামের পূর্বে মধ্য প্রাচ্যে বাইজেন্টাইন এবং সাসানিয়ান সাম্রাজ্যের আধিপত্য ছিল। এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত রোমান–পারসীয় যুদ্ধগুলো স্থানীয় গোত্রগুলোর মধ্যে এদের অপ্রিয় করে তুলেছিল।

ইসলামের প্রথম দিককার বিজয়ের সময়, রাশিদুন সেনাবাহিনী, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং 'আমর ইবনে আল-এ'-এর নেতৃত্বে উভয় সাম্রাজ্য পরাভূত হয়েছিল এবং এই অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে পরিণত করেছিল।*(Sonn পৃষ্ঠা ২৪-৬)*মাত্র এক দশকের মধ্যেই, মুসলিমরা পারস্য বিজয়ের সময় মেসোপটেমিয়া ও পারস্য এবং প্রথম বাইজান্টাইন-আরব যুদ্ধের সময় রোমান সিরিয়া এবং রোমান মিশর দখল করে নেয়। এস্পোসিতো যুক্তি দেন যে, এই বিজয় বিজিত অঞ্চলগুলোতে ইহুদি এবং কিছু খ্রিস্টান গীর্জার জন্য বৃহত্তর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিল (যেমন নেস্টোরিয়ান, মনোফিসাইটস, জ্যাকবাইট এবং কোপস যাদের রক্ষণশীল খৃষ্টান উত্তরাধিকার হিসেবে মনে করা হয়)।

(ইসলাম: সরল পথ" আমি ধর্মীয় গবেষণার পর্যালোচনা করি। 32)

ফ্রান্সিস এডওয়ার্ড পিটারের মতে:

এই বিজয়গুলো তেমন কোন ক্ষতির কারণ হয় নি: তারা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে দমন করেছিল এবং সেই সাথে সদ্য অনুগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক রক্তপাতকেও, মুসলিমরা খ্রিস্টান ধর্মকে মেনে নিয়েছিলেন, তবে তারা নিশ্চিত করেছিলেন যে; এখন থেকে খ্রিস্টান জীবনধারা, উপাসনা, এর অনুদান, রাজনীতি এবং ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয় হবে জনসাধারণের বিষয় নয়। বেশ বিদ্রূপাত্মকভাবে, ইসলাম খ্রিস্টানদের মর্যাদা হ্রাস করেছিল যা খ্রিস্টানগণ এর আগে ইহুদিদের উপর করেছিল।

বার্নার্ড লুইস লিখেছেন:

এমনকি সিরিয়া ও মিশরের খ্রিস্টানদের মধ্যে কেউ কেউ বাইজেন্টাইনদের চেয়ে ইসলামের শাসনকে অগ্রাধিকার দিতেন ... বিজয়ী প্রদেশের লোকেরা কেবল নতুন সরকারকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি, কিছু ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে এর প্রতিষ্ঠায়ও সহযোগীতা করেছিল। ফিলিস্তিনে শমরীয়রা ঐতিহ্য অনুসারে আরব অভিযানকারীদের এ জাতীয় যথেষ্ট কার্যকর সহায়তা দিয়েছিল ফলে তারা কিছু সময়ের

জন্য বিভিন্ন কর থেকে অব্যাহতিও পেয়েছিল। এছাড়া স্থানীয় ইহুদি ও খ্রিস্টান সহায়তার আরও অনেক সূত্র প্রাথমিক বিবরণগুলোতে পাওয়া গেছে।

বিজয়ের সমসাময়িক সূত্রগুলো আরও দ্ব্যর্থক চিত্র প্রকাশ করে। বিজয়ের প্রথম দিনগুলিতে লেখা জেরুজালেমের সোফ্রনিয়াসের চিঠিগুলোতে গীর্জাসমূহের পতন, ধ্বংস এবং লুণ্ঠনের বিবরণ রয়েছে।জন অফ নিকিউ ৬৯০ সালের দিকে মিশরে লেখেন, যেহেতু কিছু কপ্ট বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণে আরবদের স্বাগত জানিয়েছিলেন, অন্যান্য কপ্ট, গ্রীক অর্থোডক্স মিশরীয় এবং ইহুদিরা তাদের সম্পর্কে ভীত ছিল। তিনি বলেছেন যে, মিশরীয় খ্রিস্টান এবং ইহুদীদের কর মুসলিম বিজয়ের পরে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল যা বেশি ভাগেরই দেয়ার সামর্থ্য ছিল না।

(Encyclopedia of the Medieval Chronicle।)

মেসোপটেমিয়ায় একই সময়ের লেখায়, জন বার পেনকেয়ে আরব বিজয়কে মারাত্মক ধ্বংস ও ব্যাপক দাসত্ব, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সাথে সম্পৃক্ত রক্তক্ষয়ী অভিযান হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা তাঁর স্বজাতির উপর ঐশ্বরিক শাস্তি হিসেবে পতিত হয়েছে।খলিফা মুয়াবিয়া সম্পর্কে ইতিবাচক বর্ণনা এবং মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ সহ অন্যান্যদের প্রতি নেতিবাচক বর্ণনার দেয়ায় আরব শাসকদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মিশ্রিত বোধ হয়। একটি সমসাময়িক আর্মেনিয়ান ইতিহাসে একইভাবে লুটপাট, দহন, দাসত্ব ও ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে এই বিজয়গুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। জন বার পেনকয়ের মতো তিনিও মুয়াবিয়ার পক্ষে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। লেখক বিজয়ের খুব শীঘ্রই বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন যা প্রমাণ করে যে, আরব সেনাবাহিনীর আগমনের সাথে "সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা" শেষ হয়ে যায়নি।

(Encyclopedia of the Medieval Chronicle।)

১০.১১: অন্যান্যা পরিবর্তন

রক্তের চেয়ে অর্থের ক্ষতিপূরণ প্রদানকে উৎসাহিত করে ইসলাম আরবদের মধ্যে প্রচলিত রক্তাক্ত জাতিগত বিবাদের প্রভাবকে হ্রাস করেছিল। প্রাক-ইসলামী আরব ঐতিহ্যের বিপরীতে এক্ষেত্রে যদি ভুক্তভোগী পক্ষ রক্তের জন্য জোরারোপ করত তাহলে যে কোনও পুরুষ আত্মীয়কে হত্যার পরিবর্তে শুধুমাত্র অপরাধীকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেত।

কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইসলামে বলা হয়েছে যে, "কুরআন কেবল মানুষকে দুস্থদের যত্ন ও কষ্ট অনুভবের জন্যই তাগিদ দেয়নি, সেই সাথে শেষ দিন সম্পর্কে এর শিক্ষায় ব্যক্তি হিসেবে সকল মানুষের জন্য শাস্তির বিধানের কথা বলা হয়েছে, যাদের স্বার্থপরতা শুধুমাত্র তাদের যাযাবরীয় অমর্যাদার আদর্শ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় নি।"

(দ্য কেমব্রিজ প্রাচীন ইতিহাস)

ইসলাম দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সহায়তার শিক্ষা দিয়েছে।দরিদ্র ও এতিমদের সুরক্ষা ও সহায়তার প্রয়াসে মুসলমানদের জন্য নিয়মিত দান-যাকাতকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এই নিয়মিত ভিক্ষা প্রদান এক ধরনের আয়কর প্রদান ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল যা এককভাবে জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হত।

(Muhammad in Europe: a thousand years of Western myth- making)

★অধ্যায় ১১: জঙ্গিবাদ

ইংরেজি শব্দ militant, যার বাংলা প্রতিশব্দ জঙ্গী হল একইসাথে একটি বিশেষণ ও একটি বিশেষ্য এবং সাধারণত পুরোদমে সক্রিয়, যুদ্ধংদেহী-মনোভাবাপন্ন ও আগ্রাসী, বিশেষত 'জঙ্গী সংস্কারক' হিসেবে একটি বিশেষ কারণের সমর্থনকারী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটি ১৫শ শতকের লাতিন "militare" শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ

"একজন সৈনিকের ন্যায় * দয়িত্ব পালন করা"। বহিঃদখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক সংগঠন হিসেবে মিলিশিয়া সম্পর্কিত আধুনিক মতবাদটি

১০শ শতকের জার্মান-মার্কিন সেনাবাহিনী ফারড হতে এসেছে। সঙ্কটকালীন সময়ে, উক্ত মিলিশিয়াগণ তাদের বেসামিরক দায়িত্ব ত্যাগ করে সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালনকে এসেছে। সঙ্কটকালীনস্থা শেষ হওয়ার পর আবার পুনরায় তাদের বেসামরিক পদে ফিরে আসে।

জঙ্গি শব্দটি বর্তমান অর্থে কোন নিবন্ধিত সৈনিককে বোঝানো হয় না। এটি এমন ব্যক্তি যে অতিউদ্যমী ও অনেকসময়। চরমপন্থী কর্মকাণ্ডর ধারণাকে কোন উদ্দেশ্য, বিশেষত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গ্রহণ করে। না কয়জন জঙ্গি [রাজনৈতিক] কর্মীকে জঙ্গি হিসেবে বর্ণিত নয় এমন কর্মীর তুলনায় অধিক জেরাপ্রবন ও আগ্রাসী বলে মনে করাহয় যা জঙ্গিবাদকে বলা হয় সন্ত্রাসবাদের নতুন রূপ। বর্তমান সময়ে জঙ্গিবাদ বলতে ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে বোঝায়। ব্যুৎপত্তিগত বিচারে 'জঙ্গ' থেকেই জঙ্গি শব্দের উদ্ভব। শব্দটি মূলত ফার্সী ভাষার; যার অর্থ যুদ্ধ বা লড়াই। সে হিসেবে 'জঙ্গি' অর্থ সাধারণভাবে যোদ্ধা বা লড়াকু (জঙ্গিবাদ বলতে বোঝায় একটি উগ্রপন্থি গোষ্ঠী যারা যুদ্ধ বা সহিংসতার মাধ্যমে

সব কিছু আদায় করতে চায়। জঙ্গিবাদে শারীরিক সহিংসতা, সশস্ত্র যুদ্ধ, এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতেও পারে জাবার নাও থাকতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রটস্কাইস্ট জঙ্গি দল একটি সংবাদপত্র প্রকাশ কলাত, যা শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিল, এটি রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য বদলে দিয়েছিল, কিন্তু তা সহিংসতাভিত্তিক ছিল না, যদিও কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা অস্ত্রবিহীন লড়াইয়ের জন্য দিয়েছিল। খ্রিস্টান চার্চ জঙ্গিদের উদ্দেশ্য হল পাপ, শয়তান ও এই বিশ্বের অন্ধকারের শাসক, উচ্চক্ষেত্রে আত্মিক অধঃপতন-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।" (এফিসিয়ান্স ৬৪১২), কিন্তু এটি কোন সহিংস আন্দোলন নয়।

জঙ্গিবাদ রাজনৈতিক বর্ণালীর একটি অংশ, যার মধ্যে বর্ণবাদী, বৈষম্যবাদী, ধর্মীয় আধিপত্যবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, গর্ভপাত বিরোধী ও পক্ষপাতী ও পরিবেশবাদীগণও অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বামপন্থী, ডানপন্থী ও মানবাধিকার দলসমূহের জঙ্গীগণ যার মধ্যে অছে জঙ্গী সংস্কারকগণ, কগণ, জঙ্গী নারীবাদী, জঙ্গী প্রাণী। অধিকারকর্মী, জঙ্গী নৈরাজ্যবাদীর কথা বলা যেতে পারে। ইসলামী জঙ্গিবাদ বা জঙ্গী ইসলাম বলতে বোঝায় ইসলামী ব্যক্তি, দল, বা সরকার কর্তৃক ইসলামী সহিংস, আগ্রাসী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। বিভিন্নরকম গোপন সংগঠন যেগুলো সশস্ত্র হিসেবে পরিচিত তারাও জঙ্গি সংজ্ঞার

অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বজুড়ে এমন সব মানুষ, যাদেরকে "বন্দী করা সহজ নয়" কিন্তু যারা "আসন্ন হুমকি" হিসেবে ভূমিকা রাখে, তাদেরকে গুপ্তহত্যা করতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যবহার করে ওবামা প্রশাসন নিয়মিতভাবে প্রত্যেক বিচারবহির্ভূত হত্যার ভুক্তভোগীকে জঙ্গি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে আসছে।

১১.১: জঙ্গিবাদের বৈশিষ্ট্য

জঙ্গিবাদ রাজনৈতিক বর্ণালীর একটি অংশ, যার মধ্যে বর্ণবাদী, বৈষম্যবাদী, ধর্মীয় আধিপত্যবাদী, বিচিচ্ছন্নতাবাদী, গর্ভপাত বিরোধী ও পক্ষপাতী ও পরিবেশবাদীগণও অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বামপন্থী, ডানপন্থী ও মানবাধিকার দলসমূহের জঙ্গীগণ যার মধ্যে অছে জঙ্গী সংস্কারকগণ, জঙ্গী নারীবাদী, জঙ্গী প্রাণী অধিকারকর্মী, জঙ্গী নৈরাজ্যবাদীর কথা বলা যেতে পারে। ইসলামী জঙ্গিবাদ বা জঙ্গী ইসলাম বলতে বোঝায় ইসলামী ব্যক্তি, দল, বা সরকার কর্তৃক ইসলামী সহিংস, আগ্রাসী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। বিভিন্নরকম গোপন সংগঠন যেগুলো সশস্ত্র হিসেবে পরিচিত তারাও জঙ্গি সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

জঙ্গিবাদের বৈশিষ্ট্য: বতমানের জঙ্গিবাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ঠ্য দেখা যায় যার ফলে সাড়া বিশ্বে জঙ্গিবাদ বিপদজনক হিসেবে দেখা হয়। নিম্নে জঙ্গিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো:-

১.এরা ইসলামী আদশে বিশ্বাস করে তাই ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের এই আদশ একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আবার শুধু মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই তাদের আদশ সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং সাড়া বিশে তারা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই বিভিন্ন দেশের সরকারকে উৎখাত করে এরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চায়। যা বিশ্বের শাসক শ্রেণীর জন্য হুমকি।

২. এসব জঙ্গিরা উগ্রবাদী ও মৌলবাদী। তারা ইসলামের অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কিন্তু তাদের উগ্রবাদী ও মৌলবাদী আচরণ বিশ্ববাসীকে ভীত করে তোলে।

৩.তারা ইসলামের কথা বললেও ইসলাম অনুসরণ করে না। ইসলামের বিধিবিধান তারা মান্য করে না। ফলে মুসলমানরাও বিভ্রান্তিতে আছে আসলে তারা ইসলামের নামে কি চায়।

৪. সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হল তাদের কমকান্ড। তারা বতমান সময়ের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসীগোষ্ঠী। তাদের ভয়ানক হামলাগুলোর মধ্যে আত্মঘাতী বোমা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোচিত।

৫.অতর্কিত হামলা করে তারা মানুষ হত্যা করে, রাষ্ট্রে সম্পদ লুট করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধ্বংশ করে। ও বিশ্বে বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন ধরণের করে। হুমকি দেয়। করে হামলার জন্য তারা

৭. সবচেয়ে বড় বাপার একা রামারিক শক্তির দিক থেকে তারা শক্তিশালী। অনেক দেশের সরকারের চেয়ে তারা বেশি শক্তিশালী। বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের দমন করতে ব্যর্থ হয়। না দেশের সরকারের চেয়ে তারা অনেক শক্তিশালী।

৮. তারা এখন বিশ্বে শান্তি বিনষ্টকারী সংগঠন। বিশ্বকে তার উধাহরণ হিসেবে আফগানিস্তানের নাম আসরেমকির মুখে ফেলে দেয়। অপহরণ করে এরা মুক্তিপন দাবি করে; মুক্তিপণ না। রূপকে ভীতি তৈরি করে।

৯.সব দেশে মুসলমান দিলে এরা শিরচ্ছেদ করে এবং তা। প্রচার করে তাদের থাকায় তারা তাদের আদশকে সাড়া বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। আর তারাও প্রভাবিত হয়ে জঙ্গিদের

তদশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে। এই কারণে পশ্চিমা দেশগুলো জড়িয়ে দেয়। আর তারাও প্রভাবিত হয়ে জঙ্গিদের এরকারকে হঠিয়ে তারা ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলতে চায়।

১০. তারা সাংগঠনিকভাবেও শক্তিশালী। প্রতিনিয়তই তাদের সদস্য সংখ্যা বাড়ছে আবার নতুন নতুন জঙ্গি সংগঠনের জর লাভ করছে। বিশ্বের শাসকরা জঙ্গি সংগঠনকে দমন করলেও তাদেরংখ্যা বাড়ছে আবার নতুন নতুন জঙ্গি তাই একই দেশ নিয়ে নতুন নতুন সংগঠন নাম প্রায় বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করছে।

উদাহরণ হিসেবে এক সময়ে সাড়া বিশ্বে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে আল-কায়েদার কমকান্ড আলোচনায় ছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় যে নজিরবিহীন বিমান হামলা হয়েছিল তখন তার দোষ চাপানো হয় এই জঙ্গি সংগঠন। তাল-কায়েদার উপর। কিন্তু বতমানে এর সত্যতা নিয়ে বিত্তক আছে। এ ঘটনায় বিশ্ববাসী জঙ্গিদের ঘৃনার দৃষ্টিতে দেখে। এছাড়া আফগানিস্তানে তালেবানরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে যে আত্মঘাতী বোমা হামলা ও বরব হত্যাকান্ড চালায় তাতে ছক্তিদের বিরুদ্ধে সাড়া বিশ্ব জেগে উঠেছিল। নাইজেরিয়ায় বোকো হারামও তাদের উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে জালোচনায় আসে। বতমানে যে জঙ্গি সংগঠনটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে সেটা হল আইএস। সিরিয়া ও ইরাকে তারা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসব রাষ্ট্রে সরকার ও এদের সহযোগী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এছাড়াও আরও অনেক জঙ্গি সংগঠন আছে লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইয়মেনে আল নুসরা প্রভৃতি।

এগুলোতো আমাদের পাঠ্যপুস্তকের ধারণা আসলে জঙ্গি হচ্ছে যারা ধর্মের নাম করে সংহিসতা সৃষ্টি করে থাকে এটা শুধু ইসলাম ধর্ম নয় সকল ধর্মেই রয়েছে।

১১.৩: ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

মুসলিম রাষ্টের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্টের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম সমাজে মুসলমানদের মধ্যে, অথবা অমুসলিমদের মধ্যে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উদাহরণ খুবই কম। ইসলামের ইতিহাসের প্রচীন দু-একটি ঘটনার কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। তার আগে আমরা বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করি। বর্তমানে কিছু মুসলিম বিভিন্ন দেশে অযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষ হত্যা করছে বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে বলে শোনা যায়। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমাণিত নয়। সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ঘটনা আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস। বিন লাদেন বা তার বাহিনী তা করেছে বলে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্র এ দাবির ভিত্তিতে আফগানিস্তানের ও ইরাকের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র অযোদ্ধা নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনোভাবেই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেনি। উপরন্তু এ অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের গুয়ান্তামো বে-তে সকল মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বর্বর অত্যাচারের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাহ্যত এদের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণ ও বিচারকদের সামনে পেশ করার মত গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই বলেই এরূপ করা হচ্ছে। যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়া বা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে সন্ত্রাসের ইতিহাস পাঠ করুন। দেখবেন সন্ত্রাসের উৎপত্তি ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান খুবই কম। আমরা দেখেছি যে, সন্ত্রাসের উৎপত্তি ইহূদী যীলটদের (Zealots) হাতে। আধুনিক ইতিহাসে ভারতে, ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে অগণিত সন্ত্রাসী দল ও সন্ত্রাসী ঘটনা পাবেন। এদের প্রায় সকলেই ইহূদী, খৃস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। ভারতে, আমেরিকায় বা অন্যত্র কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা হলেই প্রথমে মুসলিমদেরকে দায়ী করা হয় এবং প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয়। পরবর্তী তদন্তে অনেক সময় এদের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করা যায় না, অথবা প্রমাণিত হয় যে, অন্যরা তা করেছে। কিন্তু সাধারণত প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয় না। এরপরও যদি

মুসলিমদের নামে কথিত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তবে তা বিশ্বের সকল সন্ত্রাসী ঘটনার কত পারসেন্ট? ১ বা ২ পারসেন্টও নয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, 'ইসলামী জঙ্গিবাদ', 'ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও হত্যা'র বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার। এরূপ মিথ্যা প্রচারণার পাশাপাশি আমরা দেখছি যে, প্রকৃতই কিছু মুসলিম ইসলামের নামে, ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে বা অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে হত্যা বা ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। সত্য ও মিথ্যা এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণ সম্পর্কে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখছি যে, সারা বিশ্বে অমুসলিম ও মুসলিম গবেষক-বুদ্ধিজীবীগণ জঙ্গিবাদের যে সকল কারণ উল্লেখ করছেন সেগুলির অন্যতম: (১) ইসলাম, (২) ইসলামী শিক্ষা, (৩) ওহাবী মতবাদ ও (৪) পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র।

১১.৪: জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

পূর্বের আলোচনায় আমরা জঙ্গিবাদ, চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও উগ্রতার পরিচয় এবং ইসলামের নামে উগ্রতা বা সহিংসতার কারণ ও প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, সকল ধর্ম ও আদর্শের অনুসারীরাই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস বা জাঙ্গিবাদে লিপ্ত হয়েছে ও হচ্ছে। সন্ত্রাস অর্থই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে অস্ত্রধারণ ও শক্তি প্রয়োগ এবং বিশেষত অযোদ্ধা ব্যক্তি বা বস্তুকে আঘাত করা বা হত্যা করা। ইসলামে সন্ত্রাসের পথ সামগ্রিকভাবে রুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে মানব জীবনকে সর্বোচ্চ সম্মানিত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং একমাত্র বিচার ও যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচার ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে ইসলামে সন্ত্রাসের পথ পরিপূর্ণভাবে রূদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা সন্ত্রাসের ঘটনা দেখতে পাই না বললেই চলে। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে উপনিবেশোত্তর বিভিন্ন মুসলিম দেশের দমন-পীড়ন নীতি, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান,

পাকিস্তান ও অন্যান্য স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিশ্বশক্তির সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী নীতি, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মুসলিম নিধন ও মুসলিম সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, আবার প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ অপব্যবহার করে "মুজাহিদ" তৈরির উদ্দেশ্যে বিশেষ "মাদ্রাসা" তৈরি করে তাদেরকে জঙ্গিতে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি বিষয় বিভিন্নভাবে উগ্রতা, জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। এক্ষেত্রে উগ্রতা, সন্ত্রাস বা জাঙ্গিবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপ্রিয়। এদেশে কখনো ধর্মীয় সংঘাত ও রক্তারক্তি দেখা দেয় নি। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা অন্যত্র যেমন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এবং একই ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ ও দলের মধ্যে হানাহানি ও রক্তারক্তির ঘটনা ঘটে থাকে বাংলাদেশে তা কখনোই ঘটে না। কিন্তু ইদানিং আমরা আমাদের দেশেও ধর্মীয় উগ্রতার উন্মেষ লক্ষ্য করছি। এ প্রবণতা রোধে আমাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

<u>১১.৫:</u> জঙ্গিবাদ বনাম ইসলামাবাদ

আরো বেশি ভয়ঙ্কর বিষয় জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের নামে ইসলামী দাওয়াতের কণ্ঠরুদ্ধ করা। মাওবাদী সন্ত্রাসীগণ বা আমাদের দেশের চরমপনহী বলে কথিত "বামপন্থী জঙ্গিগণ" যে মতাদর্শ ও দাবিদাওয়া প্রচার করেন মূলধারার মার্কসবাদী, সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী বা বামপন্থীগণও একই মতাদর্শ ও দাবিদাওয়া প্রচার করেন। অনুরূপভাবে ইসলামের নামে উগ্রতায় লিপ্ত বা জঙ্গিবাদীরা যে সকল মতাদর্শ ও দাবি দাওয়া পেশ করেন প্রায় একইরূপ মতাদর্শ ও দাবি দাওয়া প্রচার করেন মূলধারার ইসলমী রাজনীতিবিদ, আলিম, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও পীর-মাশাইখগণ। পার্থক্য হলো কর্মপদ্ধতিতে। চরমপন্থী ও জঙ্গিরা বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও খুনখারাপির মাধ্যমে তাদের আদর্শ চাপিয়ে দিতে চান। পক্ষান্তরে মূলধারার মানুষেরা দেশের আইনের আওতায় গণতান্ত্রিক

অধিকারের মধ্যে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করেন। গ্রহণ করা বা না করা জনগণের ইচ্ছাধীন।

সাম্যবাদী জঙ্গি বা সমাজতন্ত্রী সন্ত্রাসীদের কারণে কেউ মূলধারার সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীদেরকে দায়ী করেন না বা "চরমপন্থা" দমনের নামে বামপন্থী রাজনীতি ও কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন না। কেউ বলেন না যে, সাম্যবাদী রাজনীতির কারণেই চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী জন্ম নিচ্ছে; কাজেই সাম্যবাদী রাজনীতি বন্ধ করা হোক। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। জঙ্গিবাদ দমনের অযুহাতে অনেক সময় ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আইন ও বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি বা ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশের দাবি বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়।

অনেক সময় "ধর্মনিরপেক্ষতার" নামে বা "জঙ্গি" নির্মূল করার নামে "ইসলামী রাজনীতি" বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রসারমূলক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের দাবি করা হয়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার মূল দাবী হলো সকল ধর্মের মানুষকে তার ধর্ম পালন ও ধর্মের বিষয়ে তার নিজের ব্যাখ্যা ও মতবাদ প্রচারের সুযোগ দেওয়া। গ্রহণ করা বা না করা জনগণের ইচ্ছা। গণতান্ত্রিক অধিকারের আওতায় মতপ্রকাশের অধিকার দিলে উগ্রতার পথ রুদ্ধ হয়। অতীতে কোনোকোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি নিষেধ করার ফলে সমাজতান্ত্রিক জঙ্গিবাদের উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীতে মূলধারায় সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সুযোগ দেওয়ার ফলে "সর্বহারার রাজত্বের" জন্য বা সাম্যবাদের নামে সন্ত্রাস ক্রমান্বয়ে কমে যায়।

বস্তুত, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারেন। যারা ইসলামী মূল্যবোধ, আখলাক-আচরণ, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুকেই "আফিম", "প্রতিক্রিয়াশীলতা" বা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলে বিশ্বাস করেন, অথবা তাদের বাণিজ্যিক, সাম্রাজ্যবাদী বা অনুরূপ স্বার্থের প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন তারা জঙ্গিবাদের অযুহাতে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিস্তারের বা ইসলামী আদর্শ বিস্তারের সকল কর্ম নিষিদ্ধ করার দাবি করতে পারেন। মত প্রকাশের অধিকার তাদের আছে।

অনুরূপভাবে “ইসলামপন্থীরা” চরমপন্থা নির্মূল বা অনুরূপ কোনো অযুহাতে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী আদর্শ প্রচার নিষিদ্ধ করার দাবি করতে পারেন। মত প্রকাশের অধিকার তাদের আছে। তবে সরকার ও প্রশাসনকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। তাদের নিজস্ব কোনো মত বা পক্ষ থাকলেও সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাদের দায়িত্ব হয় সকলের অধিকার রক্ষা করা এবং দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখা। আমাদের বুঝতে হবে যে, ভাল বা মন্দ কোনো কথারই “কণ্ঠ” রুদ্ধ করার প্রবণতা কখনোই ভাল ফল দেয় না। বিশেষত জঙ্গিবাদের নামে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আদর্শ প্রচার, শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আইনসম্মত দাওয়াতকে নিষিদ্ধ বা বাধাগ্রস্ত করলে তা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণের অপরাধ ছাড়াও দেশ ও জাতির জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ দেকে আনবে। এ জাতীয় যে কোনো কর্ম জঙ্গিদেরকে সাহায্য করবে, তাদের প্রচার জোরদার করবে, তাদের নতুন রিক্রুটমেন্ট দ্রুত বাড়বে এবং দেশ ও জাতিকে এক ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী অশান্তির মধ্যে ফেলে দিবে।

ড.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উইকিপিডিয়া

★অধ্যায় ১২: রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনে আমাদের করণীয়

যে-কোন কিছু দূর বা নির্মূল করতে হলে তার কারণ নির্ধারণ করা জরুরি। যে সকল কারণে রাষ্ট্রসমাজ এই হালত তা হচ্ছে —

১) কুরআনী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া

২)পাঠ্যপুস্তকের অখাদ্য শিক্ষা গ্রহণ

৩) বেকারত্ব

৪) হতাশা

৫) অজ্ঞতা

৬) দারিদ্র্যতা

৭) অশিক্ষা

৮) ইসলামের নামে অপপ্রচার

৯) আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

১০) মাদক

১১) বিভিন্ন অপরাধপ্রবনতা ইত্যাদি

সুতরাং উপর্যুক্ত কারণসমূহকে যদি দূর করা সম্ভব হয় তাহলে একটি সুন্দর রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব।

★অধ্যায় ১৩: মূল্যায়ন

উপরে রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাট্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি সে সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন অধ্যায় ও সাব-অধ্যায়ের মাধ্যমে। এবং এই আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই পাঠ্যপুস্তক কখনোই একটা জাতিকে প্রকৃত জাতিতে পরিণত করতে পারে না। অনেক ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা এবং মন গড়া কিছু যুক্তি -তর্ক কখনোই রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবদান রাখে না। আমরা এ ও দেখি যে ইসলামের প্রথম যুগে আল কুরআনের ছোয়ায় ইয়াসরিবে কিভাবে একটি রাষ্ট্রসমাজ গঠিত হয়। ইয়াসরিবে বসবাসরত সকল গোত্রের মধ্যে সম্প্রতি রক্ষা করা হয়। সকল ধরনের বিদ্বেষ ভুলে সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে।আল কুরআনের আলোকে অসভ্য -অশিক্ষিত বর্বর আরব জাতি কিভাবে পরিণত হয়েছে সোনার মানুষে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলাই যায় একটা সমাজ,একটা জাতি একটা রাষ্ট্রের পরিবর্তনে জন্য কুরআনের ভূমিকা ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই রাষ্ট্রসমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক নয় বরং কুরআনের ভূমিকা সর্বাধিক।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111390851/